যখন বেলা বারোটা

প্রতিভা বসু

সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ, গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-১৩

প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৭২

প্রকাশক ঃ
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
৮।২এ গোয়ালটুলি লেন,
কলকাতা-১৩

প্রচ্ছদ ঃ
গৌতম রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
রয়েল হাফ-টোন

মুদ্রাকর ঃ
মথুরামোহন দত্ত
মা শীতলা কম্পোজিং ওয়ার্কস
৭০, ডবলু. সী ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭

ঋজুকে

১

ইন্দ্রাণী মুখার্জিকে আপনারা সবাই চেনেন। নতুন ক'রে পরিচয় দেবার কোনো দরকার নেই। এইমাত্র উনি সমুদ্রে স্নান করে এসে প্রাতরাশ সমাপ্ত করলেন। এখন ভেজা চুল মেলে দিয়ে বসে আছেন জানালার ধারে। সম্মুখেই বালুবেলা, অদূরে সমুদ্র। তাঁর হাতে একখানা বই। কিছুটা অন্যমনস্ক, কিছুটা বিষন্ন এবং সবটা মিলিয়ে ক্লান্ত। স্বামী বিদেশে, সপ্তাহখানেক হ'লো পুরীতে ছোটো একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এসে উঠেছেন। বাড়িটি একেবারে সমুদ্রের কাছে। দিবারাত্র যেন ঝড়ের দোলন, ফুলছে। এই জানালার ধারেই বসে থাকেন সব সময়, সব সময়েই হাতে একখানা বই। অমৃতা অধিকারী নামের একজন মেয়ে তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। তাঁর সহকারী। সাধুচরণ নামে একটি বয়স্ক পরিচারক আছে, আর আছে সম্পদ সিং। সম্পদ সিংকে ইন্দ্রাণী মুখার্জির স্বামী-সন্দীপ মুখার্জি একদা দেরাদুন থেকে নিয়ে এসেছিলেন। কোনো এক রাত্রে যখন সন্দীপ মুখার্জি কাজ থেকে ফিরছিলেন, একে একটি ঝোপের ধারে রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। জীপ গাড়িতে তুলে বাড়িতে এনে স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে সেবা শুশ্রূষা ক'রে ডাক্তার দেখিয়ে ভালো ক'রে তোলেন। সেই থেকে সে আজ পঁচিশ বছর তাঁদের সঙ্গেই আছে। ইন্দ্রাণী তার মা, সন্দীপ তার বাবা। এবং ইন্দ্রাণী মুখার্জির কাজে তাঁর ডান হাত বাঁ হাত। সাধুচরণ ও পুরোণো লোক।

দরজায় টোকা পড়লো। ইন্দ্রাণীর সহকারী অমৃতা উঠে খুলে দিল দরজা। একজন সুন্দরী মহিলা প্রবেশ করলেন। বয়স্ক,

সম্ভ্রান্ত, ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। পরণে দামী গরদ, গায়ে গরদের ব্লাউস, পায়ে হরিণের চামড়ার জুতো।

অমৃতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বললেন, 'আমি একটু ইন্দ্রাণী মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি আছেন?

'কী দরকার?'

'সেটা তাঁকেই বলবো।'

'বসুন।' এল সেইপের বসবার ঘরটির ঐ পাশের জানালায় বসে থাকা ইন্দ্রাণীকে এই পাশ থেকে দেখা যাচ্ছিলো না, তিনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, 'আমিই ইন্দ্রাণী মুখার্জি'।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, হাসিটা যেন পরিচিত মনে হ'লো। বললেন, 'আপনার কাছে মানুষ কী দরকারে আসে তা অবশ্যই আপনার জানা আছে। আমি এক কঠিন সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আপনি ছাড়া সে সংকট কে মোচন করবে?

'আপনি কী ক'রে জানলেন আমি এখানে আছি?

ফুল ফুটলে গন্ধ বেরোবেই। তাছাড়া দিল্লী থেকে আমার এক বন্ধু এসেছেন, তিনি খবরের কাগজের লোক, খবর রাখাই তাঁদের কাজ। উপরন্তু আপনার স্বামীর সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে। আপনারাও তো দিল্লীতে থাকেন, তাই তো?

'কী নাম ভদ্রলোকের?'

রাকেশ সমাদ্দার। আপনি চিনবেন না, কিন্তু আপনার উপর তাঁর ভীষণ ভক্তি, ভীষণ বিশ্বাস। কাল অনেক রাত অব্দি তিনি আপনার সব আশ্চর্য কীর্তি-কলাপের বিষয় বল্‌ছিলেন। একজন মেয়ে হ'য়ে, আর একজন মেয়ের এই কৃতীত্বে আমিও খুব গর্বিত বোধ করছিলাম।

অনেক ধন্যবাদ। তবে কি জানেন বর্তমানে আমি তেমন সুস্থ নেই, আমার স্বামী মাস দু'য়েক আগে বিশেষ একটা জরুরী কাজে বিলেত গেছেন, যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই খুব ছোট্ট ক'রে হ'লেও আমার একটা পরোয়ানা এসেছে ওপার থেকে—

'মানে? স্টোক।' মহিলা চমকালেন।

'ঐ আর কি।' ইন্দ্রাণী সামান্য হাসলেন, বললেন, 'অল্পের উপর দিয়েই গেছে। তবু ডাক্তারের পরামর্শ হলো কিছুকাল একেবারে চুপচাপ বিশ্রামে থাকা। সেজন্যই পুরীতে আসা। আমি খুব সমুদ্র ভালোবাসি। ভাবছি বেশ কিছুদিন থাকবো।

'আমার কোনো খুন জখমের ব্যাপার নয়। সম্পত্তির উৎপাত। শুনেছি এসব কাজ আপনি বাড়ি বসে বসে ও সমাধান করেন বুদ্ধি দিয়ে। আপনার যোগ্য সহকারিণী আছেন একজন তিনিই—

'এই আমার সহকারিণী অমৃতা অধিকারী, অসাধারণ মেয়ে।'

ভদ্রমহিলা সম্ভ্রমের সঙ্গে বললেন, ও, আপনিই তা হ'লে— নমস্কার।

অমৃতা প্রতিনমস্কার করলো।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'একে আপনি যা বলবার বলতে পারেন, এই মুহূর্তে কোনো কাজ হাতে নেয়া আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়।

'সে তো বুঝতেই পারছি। যদি একটা নির্দিষ্ট সময় দেন আমি অপেক্ষা করতেও রাজী আছি। কিন্তু আপনাকে আমার বড়ো চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কেন বলুন তো?'

'আমারও ঠিক তাই। কী জানি কখন কোথায় দেখা হয়েছিলো, আলাপ হয়েছিলো, আর দেখা হয়নি ভুলে গেছি।'

'আচ্ছা আপনার ছাত্রীজীবন কি কলকাতায় কেটেছে?'

'ছাত্রীজীবন কেন, বিবাহও হয়েছে সেই শহরেই, তারপরে ঘুরতে ঘুরতে আজ এখানে।'

'উইমেনস ক্রিশ্চেন কলেজে পড়েছেন কখনো?'

'ওখান থেকেই তো আমি আই, এ, পাশ করি।'

'এবার বুঝেছি। তখন পদবী দাশগুপ্ত ছিলো, তাই না।'

'ঠিক।'

'সেই সময়ে সুজাতা সিংহ বলে কাউকে চিনতেন?'

'সুজাতা সিংহ? হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তিনি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। আমার খুব প্রিয় অধ্যাপিকা ছিলেন। আমি তাঁকে খুব ভালো বাসতাম।'

'তাঁর বোন সুমিত্রাকে ও নিশ্চয়ই চিনতেন?'

'সুমিত্রা? আমাদের কলেজেই তো তিনি পড়তেন। আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হ'লাম, তখন তার শেষ বছর। বি. এ পাশ ক'রে চলে গেলেন এক বছরের মধ্যে। খুব সুন্দর ছিলেন মনে আছে, রোগা ছিলেন খুব।'

'আমার সঙ্গে কি তার কোনো মিল দেখেছেন?'

'আপনার সঙ্গে? আপনি—মানে—আপনিই কি তা হ'লে—'

'আমিই সুমিত্রা। সেই ক্ষীণাঙ্গী এখন এমন স্থূলাঙ্গীতে পরিণত হয়েছি।'

'কী আশ্চর্য! কতো দেখিছি আপনাকে, আমরা মেয়েরা আপনাকে আড়ালে শকুন্তলা বলতাম।

'তাই নাকি? আমিও কিন্তু আপনাকে ভীষণ পছন্দ করতাম। সেই যে নাটক করলেন 'কচ ও দেবযানী?' ঈশ্বর, কী সুন্দরই হয়েছিলো দেবযানীর অভিনয়। গোল্ডেন ভয়েস। কী আশ্চর্য মানুষের জীবন, সেই দেবযানী আজ এই বিখ্যাত মেয়ে গোয়েন্দা ইন্দ্রাণী মুখার্জি? কী করে সম্ভব হ'লো? আমি তো যতদূর জানি আপনি ইতিহাসেই এম.এ পাশ করেছিলেন। দিদি বিয়ে করলেন না, আমার বিয়ে হ'য়ে গিয়েছিলো ঐ বি. এ. পাশ করেই।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'জীবন মৃত্যু দুই-ই আমাদের সমান অজানা। আমি ও কি জানতাম, শেষ পর্যন্ত এই আমার পেশা হবে? অমৃতা একটু চায়ের বন্দোবস্ত করতে বলবে সাধুদাকে?।

'না না আমি চা খাবো না। ব্যস্ত হবেন না বরং আমাকে বলুন কী ভাবে কবে থেকে আপনি এই কাজে এখন নেশাচ্ছন্ন হলেন?'

'নেশাচ্ছন্ন বটে। কিন্তু এখনো আপনি আমাকে আপনি আপনি

করছেন কেন ? কতো ভাগ্যে কতোকাল আগের কতো সুখের সময় থেকে এক টুকরো সুখ ভেসে এসেছে কাছে, তাকে আর দূরে ঠেলে রাখা কেন ? আমার খুব ভালো লাগছে আপনাকে দেখে। সুজাতাদি কোথায় ?'

'দুর্ভাগ্য যখন আসে একলা আসেনা। তুমি তো জান—তুমিই বলছি কিন্তু—'

'একশোবার।'

'আমাদের মা বাবা ছিলেন না, দিদিই আমাকে আর আমার ভাইকে মা হ'য়ে মানুষ করেছেন। নিজের জীবনকে তো জীবন ভাবেননি, আমাদের কথাই ভেবেছেন। আমাকে ঐ জন্মই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলেন। বিয়ে দিতে বলা যায় দিদি তাঁর সর্বস্ব পণ করেছিলেন। আমার স্বামীকে দিদির ভীষণ পছন্দ হয়েছিলো। ভীষণ ভালো-বাসতেন।

বিবাহের পরে আমার স্বামীও সেই ভালোবাসা এবং পছন্দের যোগ্য বলেই নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন। ছত্রিশ বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিলো, তখন বয়েস ছিলো কুড়ি আর এখন ছাপ্পান্ন।

'তার মানে আপনার সঙ্গে আমার ছত্রিশ বছর বাদে দেখা হলো ?'

'আশ্চর্য যে তবু আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারলাম।'

'আসলে আমরা বোধহয় শেষ পর্যন্ত খুব বদলাই না।'

সুমিত্রাদেবী হাসলেন, 'তুমি খুব বদলাওনি সেটা ঠিক। এখনো কী ক'রে এমন তন্বী চেহারা রাখলে বলো তো ? তোমার গোয়েন্দা-গিরিতে কি এরও গোপন ওষুধ আছে নাকি ?'

ইন্দ্রাণীর হাসি সশব্দ হলো, 'তা তো আমিও আপনাকে বলতে পারি, সামান্য মোটা হয়েছেন এছাড়া আর তো কোনো বদল হয়নি।'

'যাক, তবু মোটা মানুষটাকে একটু আশ্বাস দিলে তুমি। অল্প-বয়সের শকুন্তলার প্রতি দেখছি বেশী বয়সেও একটু মমতা আছে। তোমার ছেলে মেয়ে কী ?

'ঐ সবেধন নীলমনি একটি মেয়ে, জার্মানীতে থাকে।'

· 'ওর বাবা, সে যে বহুদূর।'

'জামাই ওখানেই কাজ করে। মেয়েও করছে।'

চা এলো। পাকামাথা সাধুচরণ সেণ্টার টেবিলে ট্রে রেখে চলে গেল। দেখা গেল চায়ের সঙ্গে সে ভোজ্যবস্তু ও কম পরিবেশন করেনি। ফল মিষ্টি নোনতা সবই আছে।'

'করেছো কী!' সুমিত্রাদেবী প্রায় আঁৎকে উঠলেন। অমৃতা চা ঢালতে ঢালতে বললো, 'খাবার সবই ঘরের তৈরী, ইন্দ্রাণীদি কাল নিজে বসে বসে সব করেছেন।'

'ইন্দ্রাণী করেছে ? এই অসুস্থ শরীরে ? কার জন্য ?'

ইন্দ্রানী হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মন বলেছে একজন প্রিয় অতিথি আজ আসবেন।'

প্রিয় অতিথি নাকি ?

ন'ন ? আমার ষোলোবছর বয়েসের সব সৌরভ গৌরব নিয়ে এমন এক ঝাপটা বসন্তের মতো এসেছেন, আপনি প্রিয় অতিথি নন তো কে আমার প্রিয় অতিথি হবে ?

অমৃতা বললো, 'আজ সন্দীপদার মানে আমার জামাইবাবুর জন্মদিন তাই ইন্দ্রাণীদি আমাদের খাওয়াচ্ছেন।'

'বাঃ খুব ভালো দিনে এসেছি তো। ভগ্নিপতিটিকে দেখতে পাচ্ছিনা এই যা দুঃখ।

ইন্দ্রাণী সুমিত্রার আপদ মস্তক ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে বললেন, 'উনি—মানে উনি কি—'

'উনি একবছর আগে চলে গেছেন।' সুমিত্রা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন

'সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম যে বিপদ যখন আসে একা আসেনা। দিদি ক্যানসারে মারা গেলেন তার ছ'মাস আগে।'

'আহারে—'

'তবু ছ্যাখো, মন্দের ভালো আমার স্বামীর মৃত্যুটা ওকে দেখতে হলো না।'

'কী হয়েছিলো?'

'সোরিব্রেল। আট দশ ঘণ্টার মধ্যেই যা হবার হ'য়ে গেল।

চুপ ক'রে রইলেন ইন্দ্রানী। আবহাওয়াটা ভারি হয়ে ঝুলে রইলো খানিকক্ষণ। সুমিত্রাদেবীই তা লঘু করতে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, 'এসো, আজ তোমার স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করে তোমার স্বহস্তরচিত খাবারে মনোনিবশে করি।

চায়ে চুমুক দিলেন তিনি। অমৃতা এবং ইন্দ্রাণীও ঢেলে নিল চা। আবহাওয়া আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

২

'এবার বলুন আপনার কী প্রব্লেম।' ইন্দ্রাণী মুখার্জি গুছিয়ে বসলেন। সাধুচরণ চায়ের বাসন তুলে নিল।

সুমিত্রা বললেন, 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই। সুস্থ হও কয়েকদিন সমুদ্রের বাতাস খেয়ে। আমি আবার আসবো।'

'বলছিলেন সম্পত্তি ঘটিত কিছু—'

'আমার স্বামীর একখানা মস্ত বাড়ি আছে এই পুরী শহরে। বাড়ির দখল নিতে এসে নাজেহাল হচ্ছি। কতো বেনামা চিঠি যে ভয় দেখিয়ে ঘরের ফাঁক ফোঁকরে ফেলে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। তাছাড়া আমি যে হোটেলে আছি সেখান থেকে একটি মূল্যবান দলিল চুরি গেছে।'

'তাকি নাকি?' 'কোথায় ছিলো সেটা?'

'হাত ব্যাগে।'

'হাত ব্যাগটা কোথায় ছিলো?'

'রাত্রিবেলা শিয়রে নিয়েই শুয়েছিলাম।'

'ঠিক আছে। আপনি ভাবেন না। সমস্ত খুঁটিনাটি একটা কাগজে লিখে নিয়ে আসবেন কাল, ঐটা দেখে ঘরে বসেই আমি অমৃতাকে বলে দেব কী ভাবে কী করতে হবে।'

'খুব আশ্বস্থ করলে বোন। কিন্তু আমি তার আগে শুনতে চাই, তুমি কী করে এই গোয়েন্দার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলে।'

'সে তো মস্ত গল্প।'

'মস্ত গল্পই শুনবো আমি।'

'প্রথমেই আমি একটা খুনের কিনারা করি—'

'খুন! প্রথমেই খুন? সে কী।'

তখন আমরা একটা পাহাড়ি শহরে ছিলাম। মাস ছয়েক আগে সন্দীপ সেখানে পোস্টেড হয়েছে। সন্দীপ আমার স্বামী।

'তা বুঝতে পেরেছি। সুমিত্রা হাসলেন।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমি তো বটেই সন্দীপ ও কলিকাতার ছেলে। একসঙ্গেই আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেছি। এরপরে সন্দীপ আই এ এস নয়তো আই পি এস হবার তাল ক-রে এম. এ, পড়লো না। ও লেখাপড়ায় ভালো ছিলো, আমি সাধারণ। কোনোরকমে ইতিহাসে একটা অনার্স পেয়েই মহাখুশি, তাই আমি আর কোনো উঁচ ডালে হাত না বাড়িয়ে ঐ এম এ-তেই ভর্তি হয়ে গেলাম। নইলে সন্দীপ বলছিলো, তুমি ও একটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে দাও না।

বিয়ে আমরা নিজেরাই করেছিলাম। আমাদের দু-পক্ষের পিতামাতাই অসম্মত ছিলেন। সন্দীপের পিতামাতার আপত্তি ছিলো, অসবর্ণ বিবাহ, আমার পিতামাতার আপত্তি ছিলো পাত্র

অনুপোযুক্ত। পাত্র সত্যিই উপযুক্ত ছিলো না। তখনো তার ছাত্রত্ব শেষ হয়নি, উপরন্তু তার পিতা সামান্য ইশকুল মাস্টারির উপার্জনে সংসার চালাতে গলদঘর্ম। সেখানে সে কার ভরষায় বিয়ে করে বৌ নিয়ে তুলবে ? কে ভরণ-পোষণ করবে ? আমি অবশ্য মা-বাবাকে বলেছিলাম, তোমরা কি তোমাদের মেয়েকে 'অবলা- ক-রে মানুষ করেছো ? লিখিয়েছো পড়িয়েছো, স্বাধীনতা দিয়েছ, সব সময় বলেছ আমি তোমাদের ছেলেমেয়ে দুই-ই। আর এখন বলছো আমার জন্যে একটা ভরণ পোষণের লোক লাগবে। সন্দীপ যদি আমাকে ভরণ-পোষণ করে তবে ওকে ও তো আমার ভরণ-পোষণ করতে হয়।

আমার কথা শুনে মা বাবা খুব হাসলেন তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তাই না হয় হলো, তা তুইও তো এখন পর্যন্ত ছাত্রী, চাকরি না করলে তুই-ই বা কী করে ভরণ-পোষণ করবি ?

সে কথা ঠিক। মা বাবার কথা আমি মেনে নিলাম। আর সেই সুযোগে মা বাবা উপযুক্ত পাত্র ধরার ফাঁদ পাতলেন। বাবা মস্ত ডাক্তার, বিত্তবান এবং এই বিত্ত এক পুরুষের নয়। আমার দাদু ও ডাক্তার ছিলেন, তাঁর বাবা ছিলেন সরকারী উকিল। ভবানীপুরে আমাদের মস্ত তেতলা বাড়ি, ভিতরে জমি জায়গা পুকুর। অবশ্য পুকুরটা আমার বাবা আমার অল্পবয়সেই বুজিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ধারণা তাঁর মেয়ের প্রাণহানির আশঙ্কা থাকবে তা নৈলে। আমি তাঁদের একটিমাত্র সন্তান, একটু বেশী বেশী করতেন আমাকে নিয়ে।

এক সময় আমি দেখলাম, প্রায়ই আমাদের বাড়িতে অনেক যুবকের আবির্ভাব ঘটছে। তাদের মধ্যে কেউ ইন্জিনিয়র কেউ ডাক্তার, কেউ বিলেতী ডিগ্রিধারী অধ্যাপক।

বয়সে তারা সকলেই আমার চাইতে পাঁচ-দশ বছরের বড়ো। তারা গাড়ি চালিয়ে আসে, আমার সঙ্গে বন্ধুতা করে চলে যায়। চলে

গিয়ে কী বলে কে জানে, তারপরেই মা বাবার আবির্ভাব। এই আবির্ভাব সর্বদাই রাত্রিবেলা, আমার নিজস্ব ঘরে।

'সমীর ছেলেটিকে কেমন লাগলো রে তোর? আলাপটা তাঁর এইভাবে সুরু করেন।'

আগে আগে আমি সরলভাবেই জবাব দিতাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বোধগম্য হলো। বললাম, 'তোমরা কি আমার বিয়ের জন্য ভাবছো?'

মা বললেন, 'ভাবতে তো হবে।'

আমি বললাম, 'আমি তো তোমাদের বলেছি।

হঠাৎ বাবা রেগে বললেন, 'তুমি বললেই তো হবে না? আমাদেরও তো একটা বলবার অধিকার আছে?'

আমি বললাম, 'সে তো একশোবার।-

'তবে?'

'কিন্তু এটা তো অন্যরকম?

'কিছুই অন্যরকম নয়।

ইতস্তত করে কিছুটা নির্লজ্জ হয়েই বললাম, 'বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা নিশ্চয়ই তার মা-বাবার সঙ্গে থাকে না।'

'তাতে হলোটা কী?'

'যার সঙ্গে যে থাকবে তার সঙ্গে তার মনের মিল থাকা দরকার। চিনে নেয়া দরকার।'

বিয়ে হলে সকল মেয়েই সকল স্বামীর সঙ্গে মনের মিল হয়।

'যদি না হয়?'

'তাহলে বিয়ের পরে সন্দীপের সঙ্গেও তোমার তা না হতে পারে।

'সে তো পারেই, কিন্তু সেটা হচ্ছে অজানা। কিন্তু যা জানি তা তো আর অজানার জন্য বিসর্জন দেয়া যায় না।'

'কী জান?'

'জানি যে সন্দীপ আমাকে ভালোবেসে, সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করতে চায়।

মা মেয়ের নির্লজ্জ উক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন। স্বগতোক্তিতে বললেন, 'কী অসভ্য।

বাবা গলা বাড়িয়ে বললেন, খেতে জোটে না, শুতে রাঙাপাটি। ভালোবাসা! এর নাম ভালোবাসা! ওসব বাজে খেয়াল ছাড়ো। ঐ ভ্যাগাবণ্ডটার সঙ্গে আমি কিছুতেই তোমার বিয়ে দেবো না। শেষে এসে দু-জনেই আমার ঘাড়ে চাপবে। বাপ তো ইস্কুল মাষ্টার, নিজেদেরই জোটে না, আবার তোমাদের খাওয়াবে? তাহলেই হয়েছে।

এ কথার আমি মুখে কোনো জবাব দিইনি, কাজে দিয়েছিলাম। সন্দীপের উপর এবং তার শিক্ষিত মা বাবার উপর আমার বাবা যে এরকম একটা অশালীন এবং দাম্ভিক উক্তি করতে পারেন। সেটা ভেবে হতাশ না হয়ে পারিনি। অথচ আমাকে ছেলেবেলা থেকে কক্ষণো এই ধরণের মানসিকতায় ইনি বড়ো ক'রে তোলেন নি। আমি জানতাম বাবা ডাক্তার হিসেবে যতো বড়ো, মানুষ হিসেবে তার চাইতে বড়ো। অন্যকে অপমান করার এই কঠিন অন্যায়ের জন্য মনে হ'লো বাবার ঠিক এ রকমই একটা কঠিন শাস্তি পাওয়া দরকার।

বাবার এই উক্তি আমার মা-ও পছন্দ করেননি। আমার নিঃশব্দ থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু কিন্তু হ'য়ে বলেছিলেন, 'মানুষটার সব ভালো, রাগলে আর জ্ঞান থাকে না কী বলছেন। নইলে সন্দীপকে উনি নিজেও তো কতো পছন্দ করেন, ওর বাবার সঙ্গে সেদিন দেখা হ'য়ে গেল, আলাপ ক'রে কতো খুশি!

৩

সেইদিন সন্ধ্যাবেলাই আমি বাড়ি ছেড়েছিলাম। সন্দীপকে বলেছিলাম, 'যেভাবে পারো আমার বোর্ডিং খরচাটা যোগার করো আমি বাড়ি ফিরবো না।'

সন্দীপ অবাক হ'য়ে বলেছিলো, 'বোর্ডিং খরচটা মানে?'

'বললাম তো আমি বাড়ি ফিরবো না।'

'বোর্ডিংয়ে থাকবে কোন বোর্ডিংয়ে?'

'সে আমি ঠিক করেছি। আমাদের ক্লাশের সুলোচনার মাসি থাকেন সেখানে। বিয়ের নোটিশ দাও, চাকরির চেষ্টা করো।'

তারপব সব শুনে সন্দীপ আমাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলো ফিরে যাবার জন্য, ফিরিনি। বলেছিলাম, ফিরবো তোমাব স্ত্রী হ'য়ে তার আগে নয়।'

তারপর কদ্দিন বোর্ডিংয়ে থাকলাম, কবে বিয়ে করলাম, এসব খুঁটিনাটিতে না গিয়ে সংক্ষেপে যা বলা যায় তা হ'লো এই, সন্দীপ তার দু'টো সোনার মেডেল বিক্রী করেছিলো। কিছু মূল্যবান বই বিক্রী করেছিলো, কিছুটা ধার করেছিলো এবং একমাস পরে সকলের অগোচরে বিবাহ করেছিলো। আমিও সেই অবসরে একটা চাকরি যোগার ক'রে ফেলেছিলাম।

এদিকে সন্দীপের বাবা মা কিন্তু তাঁদের তিনছেলের মধ্যে একটি মেয়ে আমাকে পেয়ে স্ববর্ণ অসবর্ণ সব ভুলে অতি আদরেই গ্রহণ করেছিলেন। শোভনা দেবী অর্থাৎ সন্দীপের মা তাঁর সুশ্রী চেহারায় পৃথিবীর সব সুখ সান্ত্বনা মমতা নিয়ে আমার মাতাপিতার বিচ্ছেদ বেদনা শুধু ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন না, সকলের অগোচরে তাঁদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের ডেকেও নিয়ে এলেন। তারপর অন্য সংসারে

যা হয় আমাদেরও তাই হ'লো। মিলমিশ আনন্দ উৎসব ভোজ সব গতানুগতিক।

তারপর ছ'মাসের মধ্যেই সন্দীপ আই পি. এস. হয়ে বদলীর চাকরীতে ঘুরতে লাগলো এখানে ওখানে।

এসব পুরোণো কথা। গল্পের ভূমিকা। আসল গল্প হ'লো সন্দীপের সঙ্গে আমি একটা বাজী ধরেছিলাম। ও একটা খুনের কিনারা করতে পারছে না, আমি বললাম আমি করবো। একথা শুনে স্যুটবুট পরে চাকরিতে চলে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে এমন ভাবে হাসলো যে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বললাম, ওরকম ক'রে হাসলে যে ?'

সন্দীপ বললো, 'হাসির কথায় হাসি পেলে কী করবো ?'

'নিজে পারছো না বলে অন্যকে তুচ্ছ, না ?'

সন্দীপ বললো, 'হ্যাঁ সজনী হ্যাঁ। যা সন্দীপ মিত্র পারছে না তা পারা তেমন তেমন ঢুঁদে ডিটেকটিভের পক্ষেও কঠিন। আর তার কিনারা করবে কিনা একটি মেয়ে ? হাসি পাবে না ?

আমার সাত বছরের মেয়েকে আমি বললাম, 'দেখলি বুলা, আমরা মেয়ে বলে তোর বাবা আমাদের কেমন অপমান করলেন ? চল্ তো, দেখি গিয়ে কী হ'য়েছে ব্যাপারটা ? প্রমাণ ক'রে দিই মেয়েরা সব পারে।'

বুলা নেচে উঠলো, 'হ্যাঁ মা চলো চলো।'

আসলে এই খুনের কিনারা করা সন্দীপের কাজের আওতার মধ্যেও ঠিক পড়ে না। তবু ছিলো এটা ওর একটা চ্যালেঞ্জ।

বিন্ধ্যপর্বতের কোলে এই ছোট্ট রুক্ষ-পাহাড়ি শহরে যে দু'চারজন শিক্ষিত পরিবারের বাস ছিলো, যে মহিলা খুন হয়েছেন ইনি তাদেরই অন্যতমা। স্বামী-কনট্রাকটার কিন্তু একদা নাকি কোনো মফঃসল

কলেজের বাংলা অধ্যাপক ছিলেন। মহিলা নিজেও এক সময়ে শিক্ষিকা ছিলেন। এখানেও কিছুদিন একটা অবৈতনিক স্কুল করতে চেষ্টা করেছিলেন, চলেনি।

ভদ্রমহিলাকে আমি চিনতাম। অনেকবার দেখেছি। আলাপও ছিলো। যখন খুন হ'য়েছেন বলে রটনা হ'লো, শুনেই আমি দেখতে চলে গিয়েছিলাম। কেবলমাত্র আমিই নই, উল্টোদিকের পেট্রল পাম্পের বাড়ির পরিবার, ডাক্তার সুশোভন মুখার্জির পরিবার, সুহৃদ বটব্যালের পরিবার সবাই দৌড়ে দৌড়ে চলে এসেছিলো কৌতূহল নিবৃত্ত করতে। তারপরেই পুলিশ এসে হঠোহঠো ক'রে সবাইকে সরিয়ে দিল। পুলিশের সঙ্গে সরেজমিনে ইন্‌স্‌পেক্টারকে নিয়ে সন্দীপ ও এসেছিলো, আমাকে দেখে ভ্রুকুটি করলো, না দেখার ভান করলো, আমিও সেই ভ্রুকুটি আর না চেনার ভান ফিরিয়ে দিলাম।

ভদ্রমহিলা তাঁর শোবার ঘরের মেঝেতে উপুর হ'য়ে পড়েছিলেন। চোখের চশমাটা ভেঙে গিয়েছিলো, গলায় একটা মস্ত বড়ো রুমাল সাইজের সিলকের কাপড়ের ফাঁস ছিলো। যা শোনা গেল আগের রাত্রিতে তাঁর স্বামী কিছু মোটা টাকা এনে বাড়িতে রেখেছিলেন, পরের দিনই বেলা বারোটার সময় তাঁর কুলিদের পেমেণ্ট করার কথা সকালে কাজে বেরিয়ে গিয়ে সময় মতো নিতে এসে দেখেন এই কাণ্ড। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লো, এই টাকাটার কথা আর কেউ জানতো কিনা। তিনি বললেন, মনে হয় না। তবে একজন ভদ্রলোক। তিনি বেরিয়ে যাবার পরে এসেছিলেন বলে তাঁর ধারণা। এবং সেই ভদ্রলোক তাঁর খুব বন্ধু। এস্‌কিউলিভ ইন্‌জিনিয়র। এখানেই পোস্টেড ছিলেন, মাস তিনেক আগে বদলি হ'য়ে যান।

তারপরে এইভাবে সওয়ালটা হ'লো ঃ

'তাঁর নাম কী ?'

'তিলক চ্যাটার্জি।'

'আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও কি তাঁর বন্ধুতা ছিলো ?'

'হ্যাঁ, আমার সূত্রেই পরিচয় হয় তারপরে বন্ধুতা।'

'ঘনিষ্ঠতা ছিলো ? মানে আপনার অনুপোস্থিতিতেও তিনি আসা যাওয়া করতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার স্ত্রী তাকে পছন্দ করতেন ?'

'তা করতেন, তবে—'

'বলুন বলুন—'

'মানে, শেষের দিকে ভদ্রলোক বোধহয় একটু—'

'বলুন বলুন—'

মানে ঐ আর কি, একটু দুর্বল হ'য়েছিলেন বোধহয়।

'অর্থাৎ ?'

'আমার স্ত্রী আর শেষে ওঁর আমার অবর্তমানে আসাটা তেমন পছন্দ করতেন না।'

'বুঝেছি। তা-ও কি আসতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এখন তো বলছেন তিনি তিন মাস আগে এখান থেকে বদ্‌লী হ'য়ে গেছেন।

'তা গেছেন, তবে পর্শুদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁকে বাজারের কাছে একটা লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

'কথা বললেন না ?'

'হ্যাঁ, এগিয়ে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি তখুনি যেন কার গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। 'আর গাড়িটা দেখে আমার কেমন সন্দেহ হ'লো ওটা ধীলন সর্দারের গাড়ি।'

'ধীলন সর্দার ? সেই বিখ্যাত গুণ্ডা ? সে আবার এখানে কী ক'রে এলো। সেও তো আর এই শহরে নেই।'

'আমার ভুল হ'তে পারে। আলো খুব স্পষ্ট ছিলো না। তবে

ধীলনের সেই মান্দাতার আমলের ঝরঝরে ফোর্ডতো সবাই চেনে।

'গাড়িটা ফোর্ড ছিলো ?'

'ঝাপসা অন্ধকারে তাই মনে হ'লো। নীলামগঞ্জের রাস্তা ধরে চলে গেল।'

'তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে ভদ্রলোক এই শহরে এসেছেন, সঙ্গী ধীলন সর্দার। ওঁর মতো সম্ভ্রান্ত একজন ইনজিনিয়ারের পক্ষে যার সঙ্গে বন্ধুতা থাকা বা মেলামেশা করা স্বাভাবিক নয়। তাই না ?'

'আগে কখনো ধীলনের সঙ্গে ওকে আমি দেখিনি। ধীলনকেও ঘৃণা করতো।'

'স্বাভাবিক। সে ছিলো এই শহরের আতঙ্ক। তা পর্শু সন্ধ্যাব পরে কি আর তাঁকে দেখেছেন ?'

না।

'কী ক'রে জানলেন, আপনার অনুপোস্থিতে আজ তিনি আপনার বাড়িতে এসেছিলেন ?'

'বারান্দায় দেখলাম দু'টি চায়ের কাপ পড়ে আছে। একটি কাপের তলানিতে সিগারেটের টুকরো ডোবানো। এই সিগাবেটটাই ও খেতো। তাছাড়া আমাদের আয়াও বললো।'

দু' কাপ চা মানে, এককাপ আপনার স্ত্রী খেয়েছেন, এক কাপ উনি ?'

'স্বাভাবিক।'

'না কি ধীলন সর্দারও সঙ্গে গিয়েছিলো ?'

'মনে হয় না।'

'কতো টাকা ছিলো ?'

'ছেচল্লিশ হাজার।'

'কোথায় ছিলো ?'

'রাত্রে নিয়ে এসে তোষকের তলাতে রেখে শুয়েছিলাম। ভোর ছ'টায় বেরিয়ে যাই, ফিরি বারোটা নাগাদ। এসেই স্ত্রীকে মৃত

অবস্থায় ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখি, তোষকটা দেখলাম উল্টোনো, টাকাটা নেই।'

ভদ্রলোকের যদি আপনার স্ত্রীর প্রতি কোনো দুর্বলতা থেকেই থাকে, তা হ'লে তাঁকে খুন করবেন কেন? আর নিজে যেখানে এতোবড়ো একটা পোস্টহোল্ড করেন সেখানে ঐ সামান্য টাকাটার জন্য—

'খুব সত্য কথা। আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে যতোদূর জানি, খুন করা বা টাকা নেয়া দু'টোই অসম্ভব মনে হয়। 'সে আমার খুবই বন্ধু।'

'তাহ'লে বাকী থাকে ধীলান।'

'হ্যাঁ, সে যদি কোনো প্রকারে টের পেয়ে থাকে যে আমার বাড়িতে অত টাকা আছে তা হ'লে সে নিতে পারে।'

'আপনারা কদ্দিন যাবত এই শহরে আছেন?'

'পাঁচ বছর।'

'আগে কোথায় ছিলেন?'

'বর্ধমান।'

'বর্ধমান থেকে এতো দূরে কেন এলেন?'

'বলা যায় জীবিকার সন্ধানে।'

'ওখানে তো আপনারা দু'জনেই কাজ করছিলেন শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে দু'জন বলতে উনি তখন আমার স্ত্রী ছিলেন না।'

'কবে স্ত্রী হ'লেন?

'আমি কাজ ছেড়ে প্রথমে মির্জাপুরে আমার এক বন্ধুর কাছে আসি। সেখান থেকে এখানে।'

'এই কাজে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বন্ধুর দাদা এই কাজ করেন, বেকার অবস্থায় সখ বশতই টুকটাক তাঁর সঙ্গে কিছু করতে করতে দেখলাম, খাটতে পারলে

যথেষ্ট উপার্জন। তখন, এম এ পাশের অভিমান ভুলে এ কাজেই হাত পাকালাম।

'মির্জাপুর থেকে এই শহরে কী ক'রে এলেন?'

'ঐ দাদাই অন্য একজনের পার্টনার ক'রে আমাকে এখানে পাঠান। বলা যায় এখানে আমি আর আমার পার্টনার ছাড়া তখন আর কোনো দালানকোঠা বানাবার লোক ছিলো না। গবমেণ্টের কাজ পেয়ে গেলাম, কপাল খুলে গেল। এখন আমি আলাদা ভাবেই ব্যবসা করি।'

'বিয়েটা করলেন কবে?'

'ঐ একসময় ক'রে নিলাম।

'এখানে আপনার স্ত্রী কার-কার সঙ্গে মেলামেশা করতেন জানেন কি?'

'নিশ্চয়ই। ডাক্তার সুশোভন মুখার্জির বাড়িতে প্রায়ই যেতেন, আমিও সময় পেলে যেতাম, ওঁরাও আসতেন। এখানকার হাই ইশকুলের হেডমাষ্টার সুহৃদ বটব্যালের পরিবারের সঙ্গেও আমাদের জানাশোনা ছিলো, কম হ'লেও মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করতাম।'

'আর?'

'আর কে আছে বলুন? বাঙালী তো এ শহরে খুব কম। উল্টোদিকের পেট্রোল পাম্পে যিনি কাজ করেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ আছে, তবে যাওয়া আসা নেই। উনি বিপত্নীক।

'আচ্ছা আপনি এখন যান, বিশ্রাম করুন। যদি কারো বিষয়ে আপনার কোনো সন্দেহ মনে আসে বলবেন। একটা কথা, আপনার কর্মচারীদের মধ্যে কি কেউ এই টাকাটার কথা জানতো?

'না। জানলে ও তারা কেউ করেছে বলে আমার সন্দেহ হয় না। এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা অনেকবার আমি তাদের হাত দিয়েই এসে বাড়িতে রেখেছি।'

তাদের হাত দিয়ে আপনি কোথা থেকে আনান?

'ব্যাংক ?'

'না, যাদের কাছে পাই তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করিয়ে আনি। এজন্য তাগাদায় বেরুবার লোকও আছে।'

৯

এরপর সুশোভন মুখার্জির বাড়িতে যাওয়া হ'লো, তাঁরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লেন। একটা খুনের ব্যাপারে আবার ওদের জড়ানো কেন, এইসব বলতে লাগলেন। সুশোভনবাবু একসময়ে যুদ্ধের ডাক্তার ছিলেন, ক্যাপ্টেন উপাধি আছে। এখন প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, বয়েস পঁয়ষট্টি। স্ত্রী নয়নতারা দেবী, বয়েস ছাপান্ন। বিধবা মেয়ে আছে একজন, দু'টি ছেলে আছে তাঁর। একজনের বয়েস উনিশ, অন্যজনের পনেরো। বড়ো ছেলেটি বখাটে, তার মেলামেশার জগৎটা তথাকথিত ভাবে নোংরা, শহরে ধীলন সর্দার থাকাকালীন সে তার চ্যালা ছিলো। ছোটোটি এখনো ছাত্র।

একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হ'লো, কেবল ডাক্তারের বড়ো নাতিটিকে পাওয়া গেল না। সে কাল থেকে বাড়ি আসেনি। তার মা ভয়ে কথা বলতে পারছিলো না। ঠিক ঠাক ভাবে যা বলার তা নয়নতারা দেবীই বললেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লো।

'আপনারা কদিন এখানে আছেন ?'

'প্রায় সতেরো বছর। বলা যায় আমরাই প্রথম বাঙালী পরিবার।'

'শচীনবাবুর স্ত্রীকে নিশ্চয়ই আপনারা চিনতেন ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি যে খুন হ'লেন, এ বিষয়ে আপনাদের কি কিছু বক্তব্য আছে ? অর্থাৎ তাঁর এতোবড়ো শত্রু কে হ'তে পারে কিছু ধারণা আছে কি ?'

'দেখুন, ব্যক্তিগত ভাবে কে কার কতোবড়ো শত্রু বা কতোবড়ো মিত্র সেটা তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে বলা সহজ না। তাছাড়া এটা তো দেখা যাচ্ছে যে এরমধ্যে শত্রু মিত্রের চেয়ে চোর জোচ্চোরের পার্টটাই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। আজকালকার দিনে অতটাকা কি কেউ ঘরে রাখে ?'

'ওঁদের সঙ্গে আপনাদের কদ্দিনের পরিচয় ?'

'তা বছর পাঁচেক তো হবেই। আমাদের দোতলাটা শচীনবাবুকে দিয়েই করানো হ'য়েছিলো।'

'উনি লোক কেমন ?'

'কাজে ওঁর জুড়ি নেই, ফাঁকি দেন না, বুদ্ধিমান ও বটে।'

'শুনেছি বর্ধমানে থাকতে উনি অধ্যাপনা করতেন, হঠাৎ একাজ নিয়ে এখানে চলে আসা বিষয়ে আপনারা কি কিছু জানেন ?'

'জানিনা তবে কোনো গোলমাল আছে বলে শুনেছি।

ক্যাপ্টেন পা নাচিয়ে বললেন. 'আমর তো মনে হয় চাকরি উনি ছাড়েননি, ছাড়িয়ে দেয়া হ'য়েছিলো। এবং এই ভদ্রমহিলাকে নিয়েই গোলমাল।'

'কী রকম ?'

দেখুন শোনা কথা, ঠিক হ'তেও পারে, না ও হ'তে পারে। মিসেস মিত্র অর্থাৎ শচীনবাবুর স্ত্রী সুলতা মিত্র নাকি শচীনবাবুর সম্পর্কে ভগ্নি ছিলেন।

'তাই নাকি ?'

'উপরন্তু অন্যের বিবাহিতা 'স্ত্রী বলেও গুজব। এবং এও গুজব যে শচীন মিত্র এবং সুজাতা মিত্র অবিবাহিত।'

'তাদের কি খুব ঝগড়াঝাটি ছিলো ?

'তা জানিনা। তবে অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপার তো।'

'আপনি কি এই খুনের ব্যাপারে ওঁর স্বামীকেই সন্দেহ করছেন ?'

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন. 'না না তা নয়।' এই সময়ে তাঁর

মেয়ে মুখ খুললো, 'আপনারা কী ক'রে জানেন যে বাড়িতে টাকা ছিলো ? ওটা হয়তো শচীনবুবার বানানো কথা।'

'সে কি !'

'শচীনবাবু নিজে বলেছেন, আর তো কোনো প্রমান নেই ?'

'তা ও তো বটে।'

'তবে ?'

'তার মানে আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে, যে খুন করেছে সে টাকার লোভে করেনি, খুনের জন্যই খুন ?'

'হ'তে পারে। প্রেমটেম থাকলে ওসব হয়।'

'কার সঙ্গে কার প্রেম ?'

'কেন, তিলক চ্যাটার্জির সঙ্গে সুলতা মিত্রর। এ আর কে না জানে এখানে।'

এই সময়ে তার মা নয়নতারা ধমক দিলেন, 'এসব কী বলছো ভানু, তুমি তো কিছু জান না। সুলতা তোমাকে কতো ভালোবাসতো। কী চমৎকার মেয়ে।'

'ভালো হ'লেই বুঝি প্রেম হ'তে পারে না।'

'শচীনবাবু আর সুলতার যথেষ্ট ভাব ছিলো।' নয়নতারা থামিয়ে দিলেন মেয়েকে।

এইসব ইনটারভিউগুলো সন্দীপ একান্ত ব্যক্তিগত ভাবেই ওদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে নিচ্ছিলো। আমি সব সময়েই সঙ্গে থাকছিলাম। খুনের কিনারা করা সন্দীপের নেশা। করেওছে ত্থ'তিনটে। তাই এটাও নিজে নিজেই হাতে নিয়েছে। ওদিকে পুলিশরা ও তাদের যথাসাধ্য করছে। আমিই হংস মধ্যে বক যথার মতো সন্দিপের সঙ্গে এখানে ওখানে যাচ্ছি। যেন বেড়াবার জন্য যাচ্ছি এই রকম আমার ভাব। আসলে সন্দীপের নেশা আমাকেও পেয়ে বসেছে। সন্দীপ যখন গভীর ভাবে এসব ব্যাপারে ভাবে, ঘুমোয় না খায় না, হঠাৎ

হঠাৎ কোথায় চলে যায়, আবার ফিরে আসে উদভ্রান্তভাবে এবং দিশাহারা হলে আমার সঙ্গে আলোচনা করে তখন আমি ও খুব ভাবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনি, পরামর্শ দিই, অনেক সময় সেই পরামর্শ বেশ কাজেও লাগে। যখন কাজে লাগে সন্দীপ উচ্ছাসিত হ'য়ে বলে, 'তোমাকে আমার এ্যাসিস্টেন্ট ক'রে নিই, কী বলো ?

আমি বলি, 'নাওনা। দেখো, আমি তোমার চেয়েও ভালো গোয়েন্দা হবো।'

'মেয়ে ডিটেক্‌টিভ, না ?'

'মন্দ কী ?'

'মেয়ে, গোয়েন্দা। সন্দীপের হাসি আর থামতে চায় না।'

আমি ভেবেই পাইনা ছেলেরা মেয়েদের এতো অবহেলা করে কেন ? কেন ভাবে সব কাজ তারাই শুধু পারে, মেয়েরা পারে না। অথচ কতো প্রমাণ দিচ্ছে তারা মেয়েরা এখন কী না করে ? দর্শণ বিজ্ঞান সাহিত্য কোথায় তারা নেই। পর্বতারোহন পর্যন্ত তবে কম। কম তো হবেই। বেরুলো কবে ? স্ত্রীশিক্ষা নামে এতোদিন কোনো শিক্ষা ছিলো নাকি ? জন্ম জন্মান্তর ধ'রে তো এই-ই শুনে আসছে। যে তারা শুধু সেবাদাসী। স্বামীর সেবা পুত্র কন্যার সেবা সংসারের সেবা এই তাদের কাজ। তাদের নাম ও নেই ধাম ও নেই পদবী ও নেই। তারা অমুকের মেয়ে, অমুকের বৌ, অমুকের মা। তারা প্রথমে থাকে বাপের বাড়ি, তারপরে শ্বশুর বাড়ি, তারপরে ছেলের বাড়ি, আশ্রিত হ'লে দেওর জা ভাসুর ভাই ভাইয়ের বৌর বাড়ি। হয় পিতার পদবী নয় স্বামীর পদবী নয় দেবী দাসী।

তর্ক উঠলে যখন এসব কথা বলি সন্দীপ হাসে, বলে, 'ওসব সত্যযুগের কথা ছাড়ো তো।'

'সত্যযুগ ? সত্যযুগ তোমরা পেরিয়েছো ?' আমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠি, 'এখনো পণ না দিলে মেয়েদের বিয়ে হয় না, পণ দিলে ও

আরো কতো দাবী তার ঠিক নেই, সেই দাবী না মিটোতে পারলে কী বিষময় ফল হয় তাতো রোজই খবরের কাগজে দেখছো। কতো মেয়েকে বিষ দেয়া হচ্ছে, পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, ছাদ থেকে ঠেলে ফেলা হচ্ছে—এমন কি এই স্বাধীন ভারতেও কটা সহমরণ হ'য়ে গেল-'

সন্দীপ রণে ভঙ্গ দিয়ে বলে, 'খেতে দাও, আপিশে যাই। না কে নিয়ে খাবো ? শেষে আবার বলবে আমি সেবা করিয়ে নিচ্ছি।'

সন্দীপ আমাকে এসব নিয়ে ক্ষ্যাপাতে ভালোবাসে জানি, জেনেও রেগে যাই। সত্যি বলছি, সবাই আমাকে কেমিনিস্টই বলুন আর যা ই বলুন, মেয়েদের ব্যাপারে আমি ভীষণ স্পর্শকাতর। যে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পুরুষালি ঢং করে তারা আমার ছ'চক্ষের বিষ।

৫

সুহৃদ বটব্যালের বাড়ির জবানবন্দীও নেয়া হ'লো। বাড়িতে সুহৃদবাবু আর তাঁর স্ত্রী ছাড়া তাঁদের পুত্র। পুত্রবধু আর ছোট একটি নাতি আছে। আর একটি লোকের সঙ্গেও দেখা হ'লো, সে তাদের আত্মীয় কিন্তু ঘনিষ্ট নয়। মাঝে মাঝেই আসে থাকে কীসব ব্যবসা করে বলে যায়। পরিবারের মধ্যে তার গলাটাই একটু বড়ো। শোনা গেল। অকারণেই চটে উঠেছিলো, বলছিলো 'এই রকম মেয়ে মানুষরা খুনই হ'য়ে থাকে। যাদের সম্পর্কের ঠিক নেই তারা আবার স্বামী স্ত্রী কী ? টাকা ছিলো বলছেন, তা টাকার সঙ্গে খুনের কী সম্পর্ক। কেউ কি সকাল বেলা টাকা চুরি করতে আসে। যদি জানতেই পারে, তবে তো আগের রাত্রেই করতে পারতো।'

মিসেস বটব্যাল বললেন, 'দেখুন আমাদের সঙ্গে কথা ব'লে আপনাদের লাভ নেই, আমরা ওঁদের বন্ধু ও না বান্ধব ও না। সামান্যই

চেনা। বড়োজোর একদিন কি দু'দিন গিয়েছি ওঁদের বাড়ি। ওঁরাও ঐ রকমই এসেছেন।'

মিস্টার বটব্যাল বললেন, 'ঐ সুশোভন ডাক্তারের বাড়িতেই ভালো ক'রে খোঁজ করুন অনেক খবর বেরিয়ে যাবে। খুব বন্ধুতা ছিলো ওদের সঙ্গে। আর টাকার কথাই যদি বলেন, ডাক্তারের নাতিটি তো একটি চীজ। ওর দৌরাত্ম বোধহয় ধীলন সর্দারের দৌরাত্মকে ও হার মানবে।'

'ছেলেটি তো এই শহরে নেই।'

'নেই মানে?' আত্মীয়টি বলে উঠলো, 'আমার সঙ্গে তো দু'জনেরই দেখা হ'লো।'

'দু'জন কে?'

'কেন ধীলন আর রাম, মানে ডাক্তারবাবু নাতি।'

'তার নাম রাম?'

'নামে রাম কাজে দুঃশাসন।'

'আপনি তাদের চেনেন বুঝি?'

'চিনি?' না না, ঠিক চিনিনা, তবে ঐ মুখ চেনা।

'আপনি কি করেন?'

'ঐ ছোটো খাটো ব্যবসা।'

'কিসের ব্যবসা?'

'চূন সুরকি বালিরও করি আবার মনোহারী ও করি।'

'চূন সুরকি বালি যখন করেন তখন নিশ্চয়ই শচীনবাবুর সঙ্গে জানাশোনা আছে?'

'না না, তাঁকে তেমন চিনি না। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সংশ্রব নেই।

'তবে ধীলন আর রামের সঙ্গে আছে?'

'ছি ছি ছি, ঐ সব নোংরা লোকের সঙ্গে আমায় জড়াবেন না।'

'এই শহরে মাঝে মাঝে কী কারণে আসেন?'

'আসি। এঁরা আত্মীয় দেখাশুনো করি চলে যাই। মাতৃভাষা বলবার জন্যই সম্ভবত অস্থির হ'য়ে আসতে হয়'।

'আপনি যে শহরে থাকেন, সেটা তো শুনেছি একেবারে পাকিস্তানের বর্ডার।'

'তা বলতে পারেন।'

'চোরা পথে এখানে অনেক বিলিতি জিনিসের আমদানী হয়, আপনি কি বলতে পারেন ওসব ব্যবসা কারা করে?'

'আমি কী করে বলবো। আমি ভগবানের নামে দিব্যি ক'রে বলতে পারি, কোনো অন্যায় কাজের সঙ্গে আমি যুক্ত নই।

মিসেস বটব্যাল রাগতভাবে বললেন, 'আপনারা কি ভাবছেন এই পরিবারের কেউই এসব খুন জখম অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে?'

'না, তা ভাবছি না। তবে সন্দেহের অতীত বলেও কারোকে ভাবা আমাদের নিয়ম নয়।'

এরপরে ধীলন সর্দার আর রামের খোঁজ করা হ'লো। পাওয়া গেল না। তবে শোনা গেল খুনের আগের দিন রাত্রে তাদের শচীনবাবুর বাড়ির ঐ পাশের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। শচীনবাবু যে খুব বড়ো একটা পেমেণ্ট পেয়েছেন তার খবর বোধহয় তারা জানতো। পরের দিন বারোটায় যে এই টাকা আবার তাঁর নিজের কর্মীদের পেমেণ্টের খাতে চলে যাবে তা-ও সম্ভবত তারা জানতো।'

৬

পেট্রল পাম্পের ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েই জানা গেল সে কথা। ভদ্রলোকের পান-জর্দা খাওয়া বয়স্ক একজন হাসিখুশি, বৌদি তক্তপোষ ঝেড়ে পুছে বসতে দিলেন। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না। নাম জগমোহন সরকার। ঐ পেট্রল পাম্পের কর্মী। বিপত্নীক। বাড়িতে একটি বাইশ চব্বিশ বছর বয়েসের মেয়ে আছে, বিয়ে হয় নি। ছেলে

আছে দু'টি। একটি দিল্লীতে চাকরি করে। অন্যটি বিয়ে ক'রে ঘর জামাই হ'য়েছে। এই বৌদি এখানে থাকেন না, তার নিবাস কাশী। মাঝে মাঝে আসেন, আবার চলে যান। বললেন, 'আমি এসেছি কাল রাত ন'টা নাগাদ। সকালে উঠেই মানৎ রক্ষা করতে চলে গিয়েছিলাম মুণ্ডেশ্বরীর কালীবাড়িতে, ফিরেছি বেলায়। তখনো বাড়ির ভিতর ঢুকিনি, দেখলাম শচীনবাবুর বাড়ির দরজায় লোকে লোকারণ্য। আমাদের মেয়েও সেখানে দাঁড়িয়ে। আপনিও তো ছিলেন—' 'আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন। হেসেই প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, 'কোন্ নিষ্ঠুর এমন কাজ করলো কে জানে। কেন বা করলো। টাকা নিবি নে, প্রাণে মারলি কেন?'

জগমোহনবাবুর মেয়েটি বললো, 'শচীন কাকা বলছিলেন, এরকম টাকা তো কতবার ঘরে এনে রাখেন, এর চেয়ে অনেক বেশী ও রাখেন কখনো তো এমন হয়নি, এবার কে জানলো সে কথা, কে শুনলো সে কথা যে বাড়ি চড়াও হ'য়ে এমন সর্বনাশ ক'রে গেল।'

'শচীনবাবুকে তুমি কাকা বল?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর স্ত্রীকে কাকিমা বলতে?'

'হ্যাঁ। কাকিমা আমাকে পড়াতেন।'

'তা হ'লে তো তাঁদের বাড়িতে তুমি অনেক গিয়েছ?'

'ওখানে গিয়েই তো পড়তাম।'

'তিনিও নিশ্চয়ই আসতেন।'

'না কাকিমা কখনো আসেন নি, আমাদের বাড়িতে তো আমি ছাড়া কেউ নেই, কার কাছে আসবেন। একবার শুধু আমার জ্বর হয়েছিলো বলে দেখতে এসেছিলেন।

'আপনার সঙ্গেও নিশ্চয়ই আলাপ ছিলো।'

বৌদি সখেদে মাথা নাড়লেন, 'আহা, ছিলো না! কি মিষ্টি কথা, কী অমায়িক ব্যবহার—'

'কাল রাতে যখন এলেন তখন কি ওঁদের কারো সঙ্গে দেখা হ'য়েছিলো ?' আসার পথ তো ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই ।'

হঠাৎ চোখ বড়ো করলেন বৌদি. কিছু মনে পড়ার ভঙ্গীতে বললেন, 'দেখুন, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে ।'

'বলুন ।'

'নিশ্চয়ই জানেন, এ শহরে একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক থাকতো. নামটা আমার ঠিক মনে নেই. তবে যখনি এসেছি তখন প্রায়ই ঠাকুরপোর পাম্প থেকে পেট্রল নেয় শুনেছি । আপনি বললেন বলে মনে হচ্ছে আমি যখন সাইকেলে রিক্সাতে ক'রে আসছি তখন যেন এঁদের বাড়ির পিছন দিকের রাস্তাটায় সেই লোকটিকে আর অন্য একটি ছেলেকে দেখলাম ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাচ্ছে । আমার একটু ভয় ভয় করলো ।'

'তার মানে বলছেন সে এই শহরেই আছে ?'

আছে কিনা জানি না. শুনেছিলাম এখন অন্য জায়গায় থাকে তাই ভালো ক'রে খেয়াল করলাম না । মধ্যে মধ্যে এখানে আসে নাকিরে মুকুল ? জানিস ?'

মুকুল জগমোহনবাবুর মেয়ে । মাথা নেড়ে বললো, তা আমি জানিনা তবে কাকিমা কিন্তু বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ।'

কাকীমা ? মানে শচীনবাবুর স্ত্রী ?

হ্যাঁ ।

তাঁকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে তুমি দেখেছিলে তখন ·

'হ্যাঁ' ।

অত রাত্রে উনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন কেন, জানো ?

শচীনকাকা অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশী রাত করেছিলেন. কাকীমা চিন্তা করেছিলেন খুব । তাই পথের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ।

'সেকথা তিনি বললেন তোমাকে ?'

না। জেঠিমা যখন এসে কড়া নাড়লেন, আমি দরজা খুলে দেখতে পেলাম কাকীমা দাঁড়িয়ে আছেন।

'কী জন্য দাঁড়িয়ে আছেন জানলে কী করে 'তবে?'

ওঁদের আয়াকে লোকটিকে বলেছিলেন, তোর বাবু তো এখনো ফিরলেন না, এতো রাত কেন করা হল কে জানে। আজ আবার টাকা নিয়ে আসার কথা।

'তুমি শুনতে পেলে?

হ্যাঁ, খুব নির্জন তো তাই কম্পাউণ্ড পেরিয়ে অতো দূরের কথাও বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো।

তারপর কখন শচীনবাবু এলেন, জানো?

'পেট্রোল পাম্প থেকে বাবাও প্রায় দশটায় ফিরলেন, আর তক্ষুণি শচীনকাকার মোটর সাইকেলের শব্দও শোনা গেল। জেঠিমার খুব মাথা ধরছিলো, নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ছিলেন, আমি বাবাকে খেতে দিলাম, নিজে খেলাম। ঘরে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে কখন বেরুলেন শচীনবাবু?

'বেশ সকালে। মুখ ধুয়ে আমি সবে বাড়ির সামনের মাঠে দাঁড়িয়েছি তখনি দেখলাম শচীনকাকা মোটর সাইকেলে পা চাপাচ্ছেন আর কাকিমাকে বলছেন আমি আজ বারোটার মধ্যে ফিরে আসবো।

'অন্যদিন কখন আসেন?

দেড়টার আগে সাইকেলের শব্দ পাই না।

এই সময়ে গেট খুলে জগমোহন বাবু ঢুকলেন। আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন 'আপনারা এসেছেন? কী আশ্চর্য! কতোক্ষণ? মুকুল চা দিয়েছ এঁনাদের। বুঝতে পেরেছি কেন এসেছেন। কী ভয়ানক ব্যাপার! একেবারে উল্টোদিকে, চোখের সামনে, আপনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এই শহরে যে ভাবেই হোক এর

একটা ফয়শালা আপনাকে করতেই হবে নইলে আমরা এখানে বাস করবো কোন সাহসে?'

জগমোহন বাবু বোধহয় বাজারে গিয়েছিলেন, সাইকেলটা জানালার তলায় ঠেস দিয়ে রেখে একটা ভরা থলি মেয়ের হাতে দিলেন। রুমালে মুখের ঘাম মুছলেন।

সন্দীপ বললো, 'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি আপনাদের সাহায্যেই লাগাতে চাই।'

'আপনার বৌদি বলছেন কাল যখন উনি এলেন শচীনবাবুর বাড়ীর পিছন দিকে নাকি ধীলন সর্দার আর তার সঙ্গে আর একটি ছেলেকে উনি ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। ধীলন কি আবার ফিরে এসেছে এই শহরে?

'ঠিক ফেরেনি। বললো একদিনের জন্য এসেছে। পর্শু সন্ধ্যাবেলা আমার এখান থেকে পেট্রল নিয়েছিলো। শীগগির বিয়ে করবে। ড্রাইভারি ছেড়ে মুদি দোকান করেছে কোথায়, চুরি, জোচচুরি ও সব ছেড়ে দিয়েছে, এসব বলছিলো।

'এখানে কেন এসেছিলো জানেন'

তাতো জানিনা।

'পেট্রোল ভরে কোথায় গেল?

'সেও ত জানিনা।

'তার মানে রাত নটায় ও এখানেই ঘোরাঘুরি করেছে?

'সব্বোনাশ! বৌদি ঠিক দেখেছেন কি?

'বৌদি বললেন, ভালো করে তো তাকাই নি, লোকটা এখানে এসেছে জানলে আমার মনের ভাব অন্যরকম হ'তো।

রিকসাটা পেরিয়ে আসছিলো, হঠাৎ যেন মনে হ'লো ধীলন। আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। জগমোহন আতঙ্কিত ভাবে বললেন, 'এই সেরেছে!' তাহলে ও ব্যাটারই কাজ।

আবার তিনি ঘাম মুছলেন রুমাল দিয়ে।

সন্দীপ বললো, 'শচীনবাবুর স্ত্রী যে আপনার মেয়েকে পড়িয়েছেন তা কি প্রাইভেট টিউশনি ?

জগমোহন দুহাত তুলে বললেন, না স্যার না। তিনি তো শিক্ষা দিতে ভালবাসতেন। একটা অবৈতনিক ইস্কুলও করেছিলেন, চললো না। যখন শুনলেন মুকুল ক্লাস নাইনে একবার ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে অমনি তাকে ডেকে নিয়ে নিজে পড়িয়ে শুনিয়ে একবছরে পরীক্ষা দেওয়ালেন।

'খুব ভালো তো।'

'ভালো কি বলে ভালো? আহাহা এমন সাংঘাতিক কাণ্ডট, কে করলো কে জানে।'

ঘটনাটা সকালে ঘটলো আপনারা কিছু টের পেলেন না? মাঠ পেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে বাড়িটা কিছু দূর বটে কিন্তু দেখা তো যায় সব।

মাঠ পেরিয়ে ফটকের কাছে এলে তবেই দেখা যায়। কিন্তু আমি সেই ভোর পাঁচটায় এক কাপ চা খেয়ে পেট্রল পাম্পে চলে গিয়েছি—' 'পেট্রল পাম্প তো কোনো আলাদা জায়গায় নয়, বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তো।'

'মধ্যে বটে, একেবারে তো বিপরীত রাস্তার দিকে। বাড়ীতে থাকলে হয়তো কিছুটা দেখা যেতে পারতো।' বৌদিকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি কখন বেরিয়েছিলেন ?'

বৌদি বললেন, সাড়ে সাতটা পৌনে আটটা হবে।'

বাড়ির সামনে দিয়ে তো গেলেন, দেখতে পেলেন কিছু ?'

বারান্দায় দেখলাম তিলক চ্যাটার্জি বসে আছেন, সুলতা দেবীও বসে আছেন মুখোমুখি, গল্প করছেন দু'জনে। আমার রিক্সা পেরিয়ে গেল।'

'শচীনবাবুকে দেখলেন না ?'

'তিনি আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমি আমার ঘর থেকে

তাঁর মোটর সাইকেলের আওয়াজ শুনেছি। মুকুলও তো বললো, বেরিয়ে যেতে দেখেছি।

'তাহ'লে আপনি তিলক চ্যাটার্জিকে দেখেছেন?

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা জগমোহনবাবু, শচীনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কি শচীনবাবুর কখনো কোনো ঝগড়াঝাটি হ'তে শুনেছেন?

জগমোহনবাবু হাতজোড় করলেন, 'আমি স্যার উষায় যাই নিশায় আসি। নিজের মেয়েটা একা থাকে তার খোঁজটুকুও ভালো করে নিতে পারি না। অন্যের পরিবারের খোঁজ নেবো কি করে? এই বৌদি এলে আমি নিশ্চিন্ত হই। কতো ক'রে বলি 'এখানেই আসুন না, একা একাই তো থাকেন ওখানে, কোনো তো অন্য বন্ধন নেই? তা কই, কোনো দরকারে এসে দরকার ফুরলেই হাওয়া।' হা হা ক'রে হাসলেন।

বৌদি মুখে কাশীর বিখ্যাত জর্দার সুগন্ধি ছড়িয়ে বললেন, 'ভগবান যখন সব বন্ধন কাটিয়ে একাই ক'রে দিয়েছেন তখন আর নতুন বন্ধনে জড়ানো কেন, বলুন?' করুণভাবে হাসলেন, 'স্বামী তো আজ মারা যাননি, ভেসে ভেসেই তো আছি তারপর।' মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলে সহজ হয়ে বললেন, 'কথা বলতে গেলেই নিজের কথা এক কাহন এসে পড়ে। ঠাকুরপো, বাড়িতে মাননীয় অতিথীরা এসেছেন, তুমি বরং একটু—' আমরা দু'হাত তুলে বললাম, না না, ওসব ভদ্রতার কোনো প্রশ্নই নেই।'

'একটু চা অন্তত—' বৌদি সনির্বন্ধ হ'লেন।

আমরা বললাম, চা-ও নয়। বরং আপনি বসুন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'নিশ্চয়ই।'

কাশীতে আপনি কোথায় থাকেন?

'দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে।'

'কোনো কাজ করেন ?'

'ঐ সেলাই টেলাই শেখাই, সমিতি করি কেটে যায় দিন। একটা মানুষের আর কতটুকু লাগে ?'

'আপনি তো সারাদিন বাড়ীতে থাকেন, মানে যখন আসেন তখনকার কথা বলছি। ওঁদের বাড়িতে কে আসে যায় থাকে লক্ষ্য করেছেন কি ?'

এবার আমি এলাম তিনমাস বাদে। তিনমাস আগে তিলক চ্যাটার্জিকেই সর্বদা আসতে দেখেছি।

'তা নিয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কি কোনো গোলযোগ ছিলো ?'

এই প্রশ্নের জবাবে তিনি মুকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মামণি, যাওতো বাবা একটু ওদিকে—'

মুকুল চলে গেলে বললেন, 'দেখুন অন্যের ঘরের কথা কেউ কান পেতে শোনেনা। নেহাৎ কানে এসেছে বলেই বলছি আমি এসে যে ঘরে থাকি সে ঘরটা ওদের শোবার ঘরের মুখোমুখি। যদিও মাঠ দেয়াল রাস্তা পেরিয়ে যথেষ্ট দূর তবু অনেক সময়েই ওদের কথা কাটাকাটির শব্দ বাতাসে ভেসে আমার কানে এসেছে। বলতে বাধা নেই, জায়গাটাতো ভীষণ নির্জন, আর রাত বাড়লে তো কথাই নেই। ঝগড়া হতে হতে ওঁদের দুজনের গলাই যখন চড়ে উঠতো এবং রাতও বাড়তো তখন অনেক কথা আমি স্পষ্ট শুনতে পেতাম।'

'কী ধরণের ঝগড়া হ'তো বলবেন একটু ?'

ভদ্রমহিলা ইতস্তত করলেন, চুপ করে থেকে বললেন, 'শচীনবাবু এমনিতে ভালো লোক, সুলতামিত্র ও অতি অমায়িক মিষ্টভাষী কিন্তু দাম্পত্য জীবনে যখনি তৃতীয় ব্যক্তি আসে তখনি হয় মুশকিল।

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, ওদের ঝগড়াটা মূলত্য তিলক চ্যাটার্জিকেই নিয়েই হ'তো ?

'হ্যাঁ।'

'আপনি এখানে পর্শু রাতে এসেছেন ?

'হ্যাঁ।'

'সে রাতে কি কোনো ঝগড়া হ'য়েছিলো ?'

'হ'তে পারে আমি জানি না।'

'আপনি শোনেননি কিছু ?'

'জানলাটা বন্ধ ছিলো, আমি আর খুলিনি।

'জানালা না খুললে শোনা যায় না ?'

না। অনেক দিন এমনো হয়েছে যে ওঁদের ঝগড়া যখন তুঙ্গে উঠেছে, আমি জানালা বন্ধ না ক'রে ঘুমুতে পারিনি। কাল এতো মাথা ধরেছিলো যে সারিডন খেয়ে ইচ্ছে করেই জানালাটা না খুলে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম তাড়াতাড়ি। এইখানে জগমোহন বাবু বললেন, আমার এই তিনখানা ঘরের ছোটো কোয়ার্টারে, ঐ ঘর খানাই রাস্তার দিকে। ঐ ঘরের পূর্বেই ওঁদের বাড়ি।'

কাল সকালে আপনি কখন জানালা খুললেন ?

'খুলিনি। তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়ে গেলাম তো ?'

'বেরিয়ে যাবার পথেই দেখলেন বারান্দায় তিলক চ্যাটার্জি বসে আছেন ?'

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটু এগিয়ে গিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ড, ঐ পথটুকু পায়ে হেঁটেই যেতে হ'লো।'

'তারপর ফিরে এসেই দেখেন এই ব্যাপার।'

'আমি প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। ভীড় দেখেই এগিয়ে গেলাম, গিয়ে দেখি মুকুল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। শুনে আমিও আর কান্না চাপতে পারছিলাম না।

'আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। এবার একটু বাড়িটা ঘুরে দেখতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়ই।'

৭

এরপরে তিলক চ্যাটার্জি। খোঁজ করে তাকে ষ্টেশনে পাওয়া গেল। ধীলনকেও পাওয়া গেল সঙ্গে। বললো, সাহেবকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে এসেছি।

আপিসে এসে তিলক চ্যাটার্জি ভুরু কুচকে বললেন, 'আপনারা কি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

সন্দীপ বললো, 'আপনি তো জানেন আমাদের কাছে কেউ সন্দেহের অতীত নয়।'

'তাহ'লে তাড়াতাড়ি যা প্রশ্ন করবার করুন, আমার ছুটির মেয়াদ আর বাড়ানো যাবে না।'

'সেই মেয়াদ কি আজ ফুরোলো?'

'ফুরিয়েছে কাল।'

'কাল যাননি কেন?'

'ট্রেন ফেল করেছি।'

'ধীলনকে আপনি কদ্দিন থেকে চেনেন?'

'যদ্দিন যাবত এখানে এসেছি।'

'পর্শু সন্ধ্যাবেলা কি তার সঙ্গে তার ফোর্ড গাড়িতে কোথাও গিয়েছিলেন?'

চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'হ্যাঁ'।

'কোথায়?'

'সে আমাকে আমার জায়গায় পৌঁছে দিল।'

'আপনার জায়গাটা কোথায়?'

'আমি এখানকার ডাক বাংলোয় উঠেছি।'

'আপনি তো আজকাল এখানে থাকেন না।'

'না।'

'কোথায় থাকেন ?'

'অযোধ্যা।'

'এখানে কেন এসেছিলেন ?'

'ব্যক্তিগত কারণে।'

'সুলতা মিত্রর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ?'

'হ'তে পারে।'

'হতে পারে নয়, ঠিক ক'রে বলুন।'

'সেটাও একটা কারণ তবে সেটা প্রধান নয়।

'কোনটা প্রধান ?'

'সেটা ব্যক্তিগত।'

'আমাদের কাছে কোনো কথাই ব্যক্তিগত বলে গোপন করবেন না।'

'যে শাস্তি খুসি দিতে পারেন কিন্তু সব কথা বলা সম্ভব নয়।'

'কাল সকালে সুলতা মিত্রর বাড়ি গিয়েছিলেন ?'

'গিয়েছিলাম।'

'কেন -'

'দেখা করতে।'

'আপনার বন্ধু কে - শচীনবাবু না তাঁর স্ত্রী ?'

'দুজনেই।'

'সুলতা মিত্র শচীনবাবুর বিবাহিতা স্ত্রী কিনা আপনি কি তা জানেন -'

'একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন -'

'শহরে অনেক রকম গুজব।'

'আমি এসব গুজবে কান দিই না।'

'তার মানে একথা আপনি বিশ্বাস করেন না ?'

'কী কথা ?'

'তারা যে বিবাহ না ক'রেও স্বামী স্ত্রী রূপে বাস করেছেন সে কথা।'

'অন্যের বিবাহের সার্টিফিকেট নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যক্তি দেখতে চাইতে পারে না। সুতরাং একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করার কোনো মানে হয় না।

'এদের আপনি কদ্দিন যাবৎ চেনেন?'

'বহু বছর।'

'কতো বছর?'

'সুলতা মিত্র বর্ধমানে ছিলেন, আমি বর্ধমানের ছেলে। শচীনবাবু বর্ধমানে কাজ নিয়ে এসেছিলেন। বছরের হিসেব করলে অনেক বছরই দাঁড়ায়।'

'তা হ'লে তো জানা উচিত এঁরা কবে বিবাহিত হ'য়েছেন।'

'মানে আমি কয়েক বছর বিলেতে ছিলাম।'

ফিরে এসে কী দেখলেন?'

'এঁদের দেখিনি '

আবার কবে দেখলেন?'

'এই শহরে পোস্টেড হ'য়ে এসে।'

এ কথা কি ধরে নিতে পারি সুলতা মিত্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা খুব পরিস্কার ছিলো না?'

'খুব অন্যায় অভিযোগ' আমি সুলতা মিত্রর এ্যাডম্যায়ারার ছিলাম।'

'সুলতা মিত্র যে তাঁর স্বামীর অনুপোস্থিতে আপনার আসাটা পছন্দ করতেন না তা কি আপনি জানেন?'

'হ'তে পারে।'

এ নিয়ে যে ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ মনোমালিন্যের সঞ্চার হ'য়েছিলো তা কি আপনি জানেন?'

'না।'

'সুলতা মিত্র বলেন নি?'

'না।'

'মিথ্যে কথা।'

'তা হ'লে তাই।'

'ভালোভাবে উত্তর দিন।'

'যা জানিনা তা কী ক'রে বলবো?

'সকালবেলা ক'টার সময় আপনি ওঁদের বাড়ি গিয়েছিলেন?'

'সাড়ে ছ'টা হবে।'

'আপনি নিশ্চয়ই জানতেন শচীনবাবু বাড়ি নেই সেই সময়ে।'

'না জানতাম না।'

'তার মানে বলতে চাইছেন শচীনবাবুর সঙ্গে ও দেখা করতে ইচ্ছুক ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'বিশেষ কোনো কারণ ছিলো?'

'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবো তার আর কারণ কী?'

'তা হ'লে খুনের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় যখন শচীনবাবুকে দেখলেন, পালিয়ে গেলেন কেন?'

'পালিয়ে গেলাম? মানে? আমি তো তাকে দেখিনি।'

'তিনি আপনাকে দেখেছেন।'

'তিনি আমাকে ডাকেন নি কেন?'

আপনি এখন অন্য শহরে, অস্পষ্ট আলোয় ঠিক বুঝতে পারেন নি আপনি কি না। ধীলন সর্দারের গাড়িতে ক'রে নীলমগঞ্জের দিকে চলে গেলেন, ঠিক কি না?'

'ঠিক।'

'বলবেন কি ধীলনের মতো একটা নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? কেন তার সঙ্গে গেলেন।'

'আমি অযোধ্যায় পোস্টেড, ধীলনও অযোধ্যায় আছে। আমি ওর সঙ্গে ওর কোনো কাজেই এখানে এসেছি।'

'ওর কোনো কাজে? কী কাজ? ওর কাজ তো খুন জখম

চুরি, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই সে সবের কোনো সম্পর্ক নেই।'

'না।'

'তবে ?'

'তবে বলে একটা কথা মানুষের জীবনে থাকে। ধীলন এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম জীবন-যাপনে আগ্রহী আমি সেকথা বিশ্বাস করি।'

'সেইজন্যেই সহায়তা করতে এই শহরে এসেছেন।'

'ঠাট্টা করতে পারেন তবে সে কথাটা খাটি সত্য।'

'সেই সঙ্গে সুলতা মিত্রর সঙ্গে দেখা করা'

'শচীনবাবুর সঙ্গেও।'

সেদিন যে ওঁদের ঘরে টাকা ছিলো। তা কি আপনি জানতেন ?'

'আমি কী ক'রে জানবো।'

জানতেন না।'

'না।'

'ধীলন জানতো ?'

'সেটা আমার জানবার কথা নয়।'

'ধীলনের সঙ্গে এসেছেন, ধীলনের কাজে এসেছেন, ধীলনের গাড়িতে ঘুরছেন তবু সেটা আপনার জানবার কথা নয় ?'

'না। তবে ধীলন যে খুনের দিন সকালে এখানে ছিলো না সেটা আমি খুব ভালোভাবে জানি।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ'।

'কিন্তু খুনের আগের দিন রাত নটার সময় যে সে শচীনবাবুর বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো তা কি জানেন ?'

'ওর প্রত্যেক মুহূর্তের গতিবিধি আমার পক্ষে জানা স্বাভাবিক নয়, ওটা আপনাদের কাজ।'

'তার মানে কাল রাত নটায় ও কোথায় ছিলো আপনি জানেন না ?'

'না।'

'আপনার সঙ্গে কটার সময় নীলমগঞ্জে গিয়েছিলো?'

'আটটা সোয়া আটটা হবে।'

'তার মানে আপনাকে পৌঁছে দিয়েই ও ওখানে ঘুরঘুর করছিলো। এ থেকে কি এটাই প্রমাণ হয় না যে টাকার কথাটা ও জানতো?'

'প্রমাণ করার ভার আপনাদের উপর, আমার উপর নয়, কাজেই আমাকে জিজ্ঞাস করা বৃথা। তবে আমি য বিশ্বাস করি তা হচ্ছে এই; ও এখন ভালো হ'তে চায়, ভালোভাবে বাঁচতে চায়।'

'আপনি আজ অযোধ্যাতে যাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধীলন যাচ্ছিলো না?'

'না।'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? ওর কাজেই তো ওর গাড়িতে এসেছেন, ওরই উচিত আবার আপনাকে নিয়ে ফিরে যাওয়া।'

'উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নয়। আমার কাজ হ'য়ে গেছে, আমি চলে যাচ্ছি তাছাড়া আমার আর ছুটি নেই। ওর কাজ শেষ হয়নি তাই যাচ্ছে না। তাছাড়া ছুটিরও কোনো বালাই নেই ওর।'

'এই শহরে থাকতে ধীলনকে আপনি ঘৃণা করতেন, সে ঘৃণা মনে হয় এখন আর নেই?'

'না।'

'কারণ ঘটেছে?'

'ঘটেছে। বললাম তো ওকে আমি এখন বিশ্বাস করি। ও এখন বিশ্বাসের যোগ্য ব'লে মনে করি।'

'আপনি কি ওকে আপনার কোম্পানীতে কোন কাজ দেবেন বলে ভাবছেন?'

'ভাবলে দোষ নেই।'

'না, দোষ আর কী। এরকম একটা লোক হাতে থাকা মন্দ নয়।'

'ওকে হাতিয়ার ক'রে কোনো মন্দকাজ করবো বলে কি ভাবছেন আপনারা ?'

'আমরা গোয়েন্দা, আমরা সবই ভাবি, আবার সবই ভাবি না।'

'তা হ'লে ভাবুন। আমাকে ছেড়ে দিন, এই ট্রেনটা তো ফেল করালেন, অনুগ্রহ ক'রে অন্য ট্রেনটা ধরার সুযোগ দিন।'

'যেতে চাইছেন ?'

'কাল দশটায় আমায় আপিসে জয়েন করতে হবে।'

'শচীনবাবু বলছেন ঘরে তাঁর ছেচল্লিশ হাজার টাকা নগদে ছিলো। একথাটা কি সত্য ?'

'শচীনবাবুর কথা আমি কী ক'রে জানবো ?'

'তিনি কি এরকম মিথ্যে কথা বলতে পারেন ?'

'কেন বলবেন ?'

'ধরুণ তিনিই সন্দেহবশত তাঁর স্ত্রীকে খুন করেছেন, তারপর সেটা চাপা দেবার জন্যে ঘরে টাকা ছিলো একথাটা রটনা ক'রে বেড়াচ্ছেন। যাতে লোকেদের মনে হয় টাকা নিতে এসেই গুণ্ডারা ওঁকে খুন করেছে।'

'এ্যাবসার্ড'

'বিশ্বাস করেন না ?'

'এরকম একটা কথা কারো মাথায় আসতে পারে বলে আমি ধারণা করতে পারি না।'

'আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবেন ?'

'সবই সত্যি কথা বলছি।'

'শচীনবাবুর সঙ্গে ওঁর স্ত্রীকে নিয়ে আপনার কখনো কোনো অপ্রিয় কথা হ'য়েছে ?'

স্মার্ট তিলক চ্যাটার্জি একটু চুপ রইলেন এখানে। পরে বললেন, 'না।'

'হয়নি ?'

'না।'

'কোনো কথাই হয় নি?'

'অনেক কথাই হয়েছে, তবে তা আপনাদের কোনো কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

'সুলতা মিত্রব এই অপমৃত্যুতে নিশ্চয়ই আপনাব খুব কষ্ট হ'য়েছে?'

'স্বাভাবিক।'

'শচীনবাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'খববটা আমি অনেক পবে পাই। পেয়েই গিয়েছিলাম ওঁর বাড়িতে। ওঁকে পাইনি, দেখলাম পুলিশ ঘিরে বয়েছে।'

'এই বেদনায় বন্ধুকে নিশ্চয়ই আপনাব সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।'

'সেই উপদেশ কি আপনাদের কাছ থেকে নিতে হবে?'

'খুনেব ব্যাপাব নিয়ে সারা শহর তোলপাড় এবং আপনিও এই শহরেই আছেন, তবে অনেক দেরীতে জানলেন কেন? কখন জানলেন?'

'আজ।'

'আজ?'

'হ্যাঁ।'

'কাল কোথায় ছিলেন?'

'মাতলীর অরণ্যে আমাদেব একটা কাজ হচ্ছে, সেটা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'সারাদিন সেখানে ছিলেন?'

'আজ বেলা দশটায় এসেছি, দেড়টার সময় খবর জেনেছি, আমার ট্রেন দু'টো চল্লিশ মিনিটে। স্টেশনের পথে প্রথমে শচীনবাবুর বাড়িতে আসি, তারপর তাঁকে না পেয়ে ট্রেন ধরতে চলে যাই, তারপর এই তো আপনারা আমাকে ধ'রে এনেছেন। এখন কী করবেন? আটকে রাখবেন অথবা যেতে দেবেন?

'যেতে দেবো না সেটা ঠিক, তবে আটকেও রাখবো না। আপনি এখন যেতে পারেন কিন্তু শহরের বাইরে নয়।

৮

ধীলন এলো।

'এই শহরে আবার কেন এসেছো?'

'এখানে আমার কিছু কাম আছে, পোড়োবাড়ি আছে একটা, সেটা বিক্রী করবো—'

'সুলতা মিত্রকে চিনতে?'

'চিনতাম।'

'কথা বলেছো কখনো?'

'না।'

'দেখেছো?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি যে খুন হয়েছেন তা জানো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি ছাড়া এই শহরে আরো খুনী আছে নাকি?'

'হুজুর, আমি কোনোদিন খুন করিনি।'

'আগের দিন রাত্তিরে ওঁদের বাড়ির পিছনের রাস্তায় ঘুরঘুর করছিলে কেন?'

'কই, না তো?'

'মিথ্যে কথা বলছো?'

'হুজুর, আমি মা কালীর দিব্যি বলছি।'

'তুমি নিশ্চয়ই জানতে যে শচীনবাবু বাড়িতে টাকা রেখেছেন।'

'না।'

'মিথ্যে কথা।'

'হুজুর, মা কালীর দিব্যি আমি জানতাম না।'

'রাম তোমার সঙ্গে ছিলো সেদিন ?'

'না হুজুর।'

'নাহ, তোমার কাছ থেকে এভাবে কোনো কথাই আদায় করা যাবে না।

ইনস্পেক্টর পাঞ্জা প্রচণ্ড জোরে এক ধমক দিলেন 'ঠিক করে বলো শচীনবাবুর বাড়ীতে যে টাকা আছে তা তুমি জানতে কি না ?'

'হুজুর আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমি কিছুই জানতাম না।'

'দুষমন, তুমি সবই জানতে। জানতে বলেই রাত ন'টায় ঐ বাড়ির আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছিলে।

'হুজুর, ধর্মাবতার কালীর দিব্যি আমি রাত ন'টায় ওখানে ঘোরাঘুরি করিনি।'

'রাত ন'টায় তুমি কোথায় ছিলে ?'

'পাশের গ্রাম দণ্ডেশ্বর গিয়েছিলাম, ফিরেছি আজ ভোরে।'

'মিথ্যাবাদী! তুমি জগমোহন সরকারের ওখান থেকে পর্শু দুপুরে পেট্রল নাওনি ? বলোনি চলে যাবে ?'

'বলেছিলুম হুজুর।'

'তবে কেবল ধোকা দেয়া, না ?'

'না হুজুর। কথা সেই রকমই ছিলো। পর্শু ঠিক চলেগিয়েছিলাম। কিন্তু একটা কারণে ফিরতে হলো আবার।

'কী কারণ সেটা ?'

ধীলন মাথা চুলকালো। মিনমিনে গলায় বললো, 'কাকার কাছে টাকা চাইতে গিয়েছিলাম, বিয়ে করবো কিনা ?'

'আবার বিয়ে! কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার বাসনা!

তোমাকে কে বিয়ে করবে শুনি ? ঠিক করে বলো, কি কারণে ফিরে এসেছো।

'সত্যকথা হুজুর এখানকার একটা মেয়েকে আমি বিয়ে করবো, তার বাবা মা রাজী হচ্ছে না—মানে—আরো অনেক টাকা চায় তার বাবা। সেজন্যে দণ্ডেশ্বরে আমার কাকাকে বলতে গিয়েছিলাম সেকথা। যতো টাকা চায় ততো টাকা আমার নেই। কাকার জমি-জায়গা আছে, ভুট্টাখেত আছে, তাই ধার চাইতে গিয়েছিলাম।

'ধার দিল ?'

'না হুজুর। কতো হাতে পায়ে ধরলাম দিল না।'

'সে কথা বলতে ফিরে এসেছ ? মিথ্যে কথা বলার আর জায়গা পাওনি। দেব এক রদ্দা। তিলক চ্যাটার্জি তোমার সঙ্গে কেন এসেছিলো ? ধীলন চুপ ক'রে রইলো। সন্দীপ বললো, এখন ছেড়ে দিন একে, লক্ আপে রাখুন পরে দেখা যাবে।'

৯

এরপরে রাম

সে এসেই কান্না।

'স্যার, আমি কিছুই জানি না, আমি এখানে ছিলাম না।'

কোথায় গিয়েছিলে ? ইন্‌স্‌পেক্টার পাঞ্জার মেজাজ তখন তুঙ্গে।

'স্যার, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে।'

'ফিরেছো কখন ?'

'কাল বিকেলে।'

'তুমি কি জানো, খুনের আগের দিন রাত্রি ন'টার সময় তোমাকে আর ধীলনকে শচীনবাবুর বাড়ীর পাশের রাস্তায় ঘুরতে দেখা গিয়েছিলো ?'

'কে দেখেছে ?'

'যেই দেখে থাকুক, দেখা যে গেছে সেটা সত্য কিনা ?'

'না।'

'ঠিক করে বলো।' পাণ্ডা টেবিলে মুষ্টাঘাত করলো। চমকে গেল রাম। গলার স্বরে আবার কান্না ফুটলো। 'সুলতা মাসীকে আমি খুব ভালোবাসতাম।'

'সেই জন্যই রাত নটার সময় দেখা করতে এসেছিলে?'

সুলতা মাসি খুন হয়েছেন জেনে আমার খুব কষ্ট হয়েছে।'

'বাজে কথা শুনতে চাই না। বলো তার সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে।'

'আমি বাবুদের সঙ্গে অভয়ারণ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম সোমবার। তার মানে যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটলো তার দু'দিন আগে। যাবার সময় এই পথ দিয়েই যেতে হয়েছিলো। সুলতা মাসি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন 'কোথায় যাচ্ছিস?'

আমি বললাম অভয়ারণ্যে, উনি একটু বকলেন আমাকে, বললেন তোকে আর মানুষ করা যাবে না। কী বলেছি? বইটই নিয়ে আমার কাছে আসতে বলিনি? ইসকুলে যেতে লজ্জা পাস তো আমার কাছে পড়বি, প্রাইভেটে পরীক্ষা দিবি। দেখতো মুকুল কী রকম পাশ ক'রে গেল।

'মুকুল কে?'

পেট্রোল পাম্পের জগমোহন সরকারের মেয়ে।'

'তারপর?'

'আমি তখন সুলতামাসির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ফিরে এসে আর কোনো অন্যায় কাজ করবোনা, কোনো দুষ্টমি করবোনা, নিয়ম মতো পড়াশুনো করবো।'

'তুমি যে ধীলনের চ্যালা তা কি তিনি জানতেন।'

একটু অস্বোয়স্তি বোধ করলো রাম, মুখ নিচু ক'রে বললো, ধীলন তো এখন এখানে নেই।'

'নেই কিন্তু আসে তো'।

'আমি দেখিনি।'

সন্দীপ বললো, মিষ্টার পাঞ্জা এবার আমাদের একবার শচীনবাবুর বাড়ি যেতে হবে। উনি অপেক্ষা করবেন, এখন একে ছেড়ে দিন।

ছাড়া হলো রামকে। পাঞ্জা প্রায় পাঞ্জা কষে বললো, আমি বলছি স্যার, ধীলন ব্যাটারই কর্ম এটি, আর এ হচ্ছে তার সাগরেদ।

কী শয়তান দেখলেন তো, কী রকম অম্লান মুখে একটার পর একটা মিথ্যে বলে গেল। চাতুরিটা দেখুন একবার কেঁদে কেঁদে বলে আমি সুলতা মাসিকে ভালোবাসতাম।

থানায় আটকে কোন কিছু কোঁৎকা দিলেই বেরিয়ে যাবে সব।

দেখুন আন্দাজে তো কিছু করা যায় না। সবটারই একটা আইন কানুন আছে। এবং সেটা আমাদের মানা উচিত।

'বুঝলেন স্যার, এসব ক্ষেত্রে 'মার ইজ দ্যা ওনলি মেডিসিন' ঐ মারের চোটে সব বলতে বাধ্য হবে। আপনি হুকুম দিলে ধীলনকে সুঁচ বেঁধাই।

না না তা হয়না। সন্দেহ তো এখানে অনেককেই করা যায়। ধরুণ তিলক চ্যাটার্জি, তাঁর কেসটাও তো খুব পরিস্কার নয়?'

'যা বলেছেন। পাঞ্জার বিগলিত হাসি গাল চুঁইয়ে বেরিয়ে এলো। ষড়যন্ত্রীর গলায় বললো, কী দিনকাল পড়েছে। মেয়েছেলেদের এখন বিশ্বাস করাই কঠিন।

সন্দীপ একবার তাকালো। অমনি ভয়ে অনুগত হ'য়ে হাত ঘষতে লাগলো।

এরপরে ইনস্পেকটরকে নিয়ে সন্দীপ আবার শচীনবাবুর বাড়িতে গেল।

আবার ঘুরে ফিরে সব দেখলো। বাড়িটার তিনদিকে কোনো জনবসতি নেই, শুধু পূবদিকে পেট্রল পাম্পের ছোট্ট কোয়ার্টারটা। তাও বেশ দূর। রাস্তা পার হ'য়ে কম্পাউণ্ড, কম্পাউণ্ডের কোনে বাড়ি। পাম্প অন্য রাস্তার মুখে। অন্যতিনটে রাস্তার একটা গেছে

স্টেশনের দিকে, একটা বোটের দিকে একটা বাজারের দিকে।

শচীনবাবুর বাড়িটি একতলা। চারখানা বড়ো বড়ো ঘর। তার একখানা নিজেদের শোবার আর একখানা অতিথি অভ্যাগতদের জন্য রাখা, অন্য দুখানার একখানা বসবার অন্যখানা খাবার। সুন্দর ভাবে সাজানো গুছোনো। দেখলেই বোঝা যায় রুচি আছে। বড়ো শোবার ঘরখানার পূবদক্ষিণ খোলা। বসবার ঘরের সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দা, সেখানে সুদৃশ্য সব বেতের চেয়ার পাতা।

বেশীর ভাগ সময়ই ঘরে না বসে ওঁরা বাইরেই বসতেন।

সামনে পিছনে দুদিকেই প্রবেশ পথ।

পিছন দিকে ছোট্ট উঠোন একটি আমগাছ আছে, একটি পেয়ারা গাছ আছে, একটি জাম গাছ আছে।

সামান্য ঝুপসি ঝুপসি অন্ধকার। ঐ প্রবেশ পথটি কাজের লোকজনদের যাতায়াতের জন্য। মোটামুটি সব সময়েই খোলা থাকে। উঠোন পার হ'য়ে সোজা শোবার ঘরের দরজা পাশে খাবার ঘর, সামনে বসবার ঘর। শোবার ঘরের দক্ষিণে একটি বড়ো জানালা পূবে একটি বড়ো জানালা। পূবের জানালা দিয়েই জগমোহন সরকারের বাড়িটা দেখা যায়।

সন্দীপ ঘুরে ফিরে বাড়িটা দেখে ঠিক কোন জায়গায় টাকাটা রেখেছিলেন তা ও দেখলো। ভদ্রমহিলা যেখানটায় পড়েছিলেন তখনো দাগটা মিলিয়ে যায়নি। সাদা একটা মানুষের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে আছে। চলে এলো গভীর চিন্তা নিয়ে।

১০

বাড়ি ফিরে এলে খেতে বসে আমি বললাম, কিছু হদিস মিললো ?

সন্দীপ মাথা নাড়ালো। একটু পরে বললো 'তোমার কী মনে হয় ?

আমি উল্টে বললাম 'তোমার কী মনে হয় ?' সন্দীপ বললো, 'মিষ্টার পাঞ্জা বলছে এটা ধীলনেরই কাজ, সহচর ঐ রাম।'

'বিচিত্র নয়।'

'তবে তোমার ও কি তাই মত ? আমার কিন্তু ঐ দু'টি লোককেই সন্দেহ।'

কাকে কাকে ?'

'হয় শচীন মিত্র, নয় তিলক চ্যাটার্জি।'

.শচীন মিত্র কেন খুন করবেন স্ত্রীকে ? আর নিজের টাকা নিজে চুরি করবেন ?'

টাকার কথাটা ধাপ্পাও হ'তে পারে।'

'তা না হয় হ'লো কিন্তু খুনটা করবেন কেন ?

'সন্দেহ।'

কিসের সন্দেহ ?

'তিলক চ্যাটার্জিকে নিয়ে। সন্দেহ ঈর্ষা এসবগুলো মানুষকে অমানুষে পরিণত করে।

'এতোদিন যদি বন্ধুকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন তবে হঠাৎ সেদিন খুন করবেন কেন ?

এসব ঘটনা তো এরকম হঠাৎই ঘটে, ধরো আগের দিন সন্ধ্যায় ঐ ভাবে ধীলনের সঙ্গে তাকে দেখা, লোকটির পালিয়ে যাওয়া, পরের দিন বাড়ি ফিরে এসে জানতে পারা যায় যে তিলক চ্যাটার্জি

তার অবর্তমানে এখানে এসে তার স্ত্রীব সঙ্গে বসে চা খেয়ে গেছে? এগুলো সহ্য করা নিশ্চয়ই কঠিন।

'তা বটে।'

'শহর ছেড়ে চলে গেছে সেটা ঠিক, আবার এটাও তো প্রমান হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে আসেন ভদ্রলোক। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাদের গোপন প্রণয় অবাধেই চলছিলো।

'তা বটে।'

'হয়তো ফিরে এসে দেখেই মেজাজ চড়ে গেছে। লেগে গেছে ঝগড়া তারপর এসবের যা অবশ্যম্ভাবী ফল তাই হয়েছে।'

ভদ্রমহিলা কি দম বন্ধ হ'য়েই মারা গেছেন প্রমাণিত হয়েছে?

'হ্যাঁ। আমার যদ্দুর ধারণা রাগে অন্ধ হ'য়ে শচীনবাবু খুব জোরে একটা ধাক্কা মেরেছেন, মহিলা উপুড় হ'য়ে ছিটকে পড়েছেন, বুকটা পড়েছে খাবার ঘরের চৌকাঠে, সেই আঘাতেই হয়তো দমটা বন্ধ হয়ে গেছে, মুচ্ছা গেছেন উঠতে পারেননি, শচীনবাবু ছুটে এসে তৎক্ষণাৎ রুমালটা দিয়ে ফাঁস দিয়েছেন গলায়, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

এই কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে গেল। সেই সঙ্গে শচীনবাবুর মুখটা মনে পড়ে গেল। এলোমেলো চুল, চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত, সারা মুখে সুস্পষ্ট বেদনার ছাপ। দেখতে ভদ্রলোক কালোর উপর ভারি সুন্দর। এই সুশ্রীতা ওঁর স্ত্রীর ও ছিলো। যাকে বলে লাবণ্য তা ওদের দুজনের মুখেই এতো বেশী ছিলো যে তাকালেই ভালো লাগতো। আমি বলে উঠলাম 'না না শচীনবাবু না, শচীনবাবু না।

স্থির নিশ্চয় না হয়ে তুমি যেন কোন রায় দিয়ো না।

খুনের মামলা যদি নির্দোষ হয়, তাহ'লে তো বলার নেই। একটা মানুষের সমস্ত জীবন নষ্ট হয়ে যাবে?

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছিনা।

'একটা কথা বলবো?

'নিশ্চয়ই'।

'তোমার ইন্সপেক্টরটির বুদ্ধিসুদ্ধি বড় মোটা, ওকে দিয়ে কিছু হবে না।'

'সে আমি জানি।'

কাজেই তুমি না পারলে এই খুনের কিনারা হওয়া কঠিন।

'আসলে কি জানো, গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করলেও আমি জাত গোয়েন্দা নই। বইয়ে যেমন পড়া যায় সমস্যা যতো সস্তাই হোক, সত্যসন্ধানীরা ঠিক তার জট খুলে দিতে পারে। আমি পারি না। আমার ইনটারেষ্ট আছে, মাথাটা কিছু খেলেও বটে কিন্তু তাদের মতো নয়। দেখছোনা সব সময় তোমার সঙ্গে কি রকম পরামর্শ করে চলি। কোনো সত্যিকারের গোয়েন্দা কক্ষনো কারো সঙ্গে এমন খোলাখুলি কথা বলে না বা পরামর্শ করে না। স্ত্রীর সঙ্গে তো নয়ই।

আমি হেসে বললাম, 'এসব বিষয়ে আমি কিন্তু তোমার স্ত্রী নই, এ্যাসিস্টেন্ট। মনে আছে সেবার কর্বেট পার্কে কী রকম ছদ্মবেশে চলে গেলাম? তোমার কোনো পার্সনাল তরুণ-যুবক এ্যাসিস্টেন্ট ছাড়া ওঁরা আমাকে আর কিছু ভাবতেই পারলো না।

সন্দীপ ও হাসলো, 'গুরুমারা বিদ্যায় তোমার বেশ দখল আছে। আমি অনেক সময়েই দেখেছি, অতি সহজে তোমার মাথায় যে বুদ্ধি খেলে যায় আমার তা ভাবতে দু'রাত কাটে। সত্যি সত্যি একজন মেয়ে গোয়েন্দা হয়ে যাবে নাকি শেষে?

আমি রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে বললাম, মন্দ কী? ট্রেনিংটা তো তোমার কাছে আমার ভালোই হয়েছে, অন্য চাকরি না খুঁজে এটাই করি বরং কী বলো'?

এই খুনের মামলাটাই হাতে নিয়ে নাও তাহ'লে!

এটা সন্দীপের ঠাট্টা। যেমন সে সব সময় ক'রে থাকে। আমি কিন্তু ওর হাত জড়িয়ে ধরলাম, সিরিয়াস হয়ে বললাম 'দেবে আমার হাতে?

সন্দীপ খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বললো, 'দেয়াদেয়ির কী আছে? তোমার বুদ্ধি দিয়ে তুমি চিন্তা করো না, সেখানে তুমি তো স্বাধীন'।

সাহায্য চাইলে সত্যি সাহায্য দেবে তো?

সন্দীপ ঠাট্টার ভঙ্গিতেই বললো, বান্দা মহারানীর সব হুকুম তালিম করতেই রাজী।'

রাজী তো?'

আলবাৎ রাজী।

'তা হ'লে এই খুনের কিনারা আমি করবো তো?

এসো, আপাতত নৈশ নিদ্রার বন্দোবস্তটা করি।' সন্দীপ হাই তুললো। বেচারার ঘুম পেয়েছে।

আরো দু'চারটা ঠাট্টা তামাসা ক'রে ও বিছানায় চলে গেল, এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি টুকটাক সাংসারিক কাজ সারলাম, বুলার মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিলাম, তারপর শুলাম। শুয়ে কিন্তু আমার ঘুম এলো না। মাথার মধ্যে চর্কির মতো ঘুরতে লাগলো এই খুনের চিন্তা। ভোর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েও স্বপ্নের মধ্যে কখনো সুহৃদ বটব্যাল, কখনো জগমোহন, কখনো ডাক্তার সুশোভন মুখার্জি, কখনো বা তিলক চ্যাটার্জি শচীন মিত্র, এরা সব ভিড় ক'রে আসতে লাগলো। ধীলনকেও ছুরি হাতে কাকে তেড়ে যেতে দেখলাম, দেখলাম রামের মা কাঁদছে, মুকুল ভয়ে তার জ্যাঠাইমাকে আঁকড়ে ধরেছে আর আমি দু'হাতে দু'টো পিস্তল নিয়ে কোথায় কোথায় ছুটে বেড়াচ্ছি। সন্দীপ বলছে, তুমি কি পাগল হ'লে? এসব বুদ্ধি ছেড়ে দাও। এর মধ্যে কতো বিপদ তা তুমি জানো?'

আমি বলছি, 'জানি। কিন্তু আমার হাতে তো তার প্রতিকার আছেই। তোমার কাছেই তো দু'হাতে বন্দুক চালাতে শিখেছি আমি।

তাছাড়া সুলতা মিত্র আমাকে বলেছেন আমি যেন অপরাধীকে শাস্তি দিই।'

'সুলতা মিত্র? তিনি কোথায়? তিনিই তো খুন হ'য়েছেন।'

এ্যাঁ, তাইতো—ঘুমটা ভেঙ্গে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তখনো ভোর ফোটেনি, কুয়াশা কুয়াশা আকাশ, আমি উঠে পড়লাম।

১১

আপিসে যাবার আগে আমি যখন সন্দীপকে বললাম, সন্দীপ, আমাকে দিন চারেকের ছুটি দাও। সন্দীপ অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো ছুটি! কিসের ছুটি? কী বলছো?'

'তোমার সঙ্গে আমার দিন চারেক দেখা হবে না।'

'মানে?'

'বুলা থাকবে, বুলার আয়া পদ্মাবতীই দেখাশুনা করবে ওকে তুমি শুধু একটু শীগ্‌গির শীগ্‌গির ফিরবে কাজ থেকে। আর ইশকুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসাটা ও করতে হবে তোমাকে।'

তোমার কথা আমি মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না ইন্দু।

'আমি সব বুঝিয়ে দেব ফিরে এসে।'

সন্দীপ তখনো অবাক। আমি মনে করিয়ে দিলাম যে কাল রাতে সে আমাকে যে খুনের কিনারা করতে বলেছে, তার জন্যই এ কদিনের অনুপোস্থিতি আমার দরকার।

হেসে আমার মাথায় টোকা দিয়ে বললো নাহ্, মাথাটা দেখছি একদম খারাপ হ'য়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'আমার জেদ তো তুমি জানো? আমি যা ধরি তা করি।

হ্যাঁ, বিয়েটা অন্তত সেই জেদেরই যে ফসল তা অবশ্য জানি।'

'এই খুনীকে আমি তোমার সামনে উপস্থিত করবো সেটাও আমার একটা জেদ'।

'ইন্দু—।'

'আমি ঠিক বলছি।'

সত্যি 'এতো তোমার আত্মবিশ্বাস?'

'দেখোই না তুমি।'

একটু রাগ করলো সন্দীপ। 'ঠিক আছে যা খুশি তাই করো, 'আমি কিছু জানিনা, বলে সে আপিসে চলে গেল।

সন্দীপ রাগ করলেও আমি কিন্তু আমাব সংকল্পে অটল রইলাম। সারাদিন একই চিন্তাতেই বিব্রত থাকলাম। বুলাকে বোঝালাম, চার দিন তাব মা তার কাছে থাকবে না। সে যেন মন খরাপ না করে। যেন লক্ষ্মী হয়ে থাকে। পদ্মামাসি সব করে দেবে।

বাবা তাড়াতাড়ি আপিস থেকে ফিরবেন, কোনো অসুবিধে হবে না। বাবার গাড়িতেই সে ইশকুলে যাবে, ইশকুল থেকে ফিরবে।

একটু ঘ্যান ঘ্যান করেই বুলা রাজী হ'য়ে গেল। কথা দিলাম ফিরে এসেই দু'চাকার সাইকেল কিনে দেবো।'

সন্দীপ আপিস থেকে সহজ মনেই ফিরে এসেছিলো, আবার বিফল হয়ে গেল পুনরায় একই প্রস্তাব শুনে। রীতিমতো রেগে গিয়ে বললো, 'শোনো ইন্দু যাকে যে কাজ সাজে তাকেই সে কাজ করতে দাও। ওটা আমাদের বিভাগের কাজ। আমি না পারলেও কোনো অসুবিধে হবে না তাদের। সরকার টাকা দিয়ে বহু লোক পুষছেন এজন্য। তাছাড়া এটা প্রায় প্রমাণিত হয়েছে যে কাজটা এক-জনের নয়। একটা ষড়যন্ত্র আছে এর পেছনে। শচীনবাবুর অনেক শত্রু ছিলো। এবং এটাও প্রমান হ'য়েছে সুলতা মিত্র সত্যি শচীন বাবুর বিবাহিত স্ত্রী নন।'

আমি চায়ের বন্দোবস্ত করছিলাম, সব সরঞ্জাম নিয়ে টেবিলে বসে বললাম, এতো খোঁজ একবেলার মধ্যে তোমাকে কে দিল ?'

তুমি জানো নিশ্চয়ই আমি এখানকার ডি, সি, একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজেই আমাকে এখানে বহাল করা হয়েছে।

'জানি। জানি বলেই যে যা বলে সব তোমাকে বিশ্বাস করতে বারণ করি।'

'চাকরিটা কি আমি তোমার বুদ্ধিতে করি ?

হেসে বললাম, বুদ্ধি এবং বিদ্যা দুই-ই যে তোমার চেয়ে আমার অনেক কম সেটা কি আমি আজ জানি ?

'আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি না।'

'আমিই কি করেছি ? তুমি হ'লে পয়লা নম্বরী ছাত্র। প্রতিযোগীতায় উঁচু নম্বর পাওয়া লোক, একটা ডাকসাইটে আই. সি. এস, অফিসার—

'আমি তোমাকে কোনো বিপদের মধ্যে যেতে দিতে পারি না। হাজার হোক তুমি একজন মেয়ে'।

'ছাখো, বিয়ের সময় আমি আমার বাবাকে বলেছিলাম, যেহেতু তিনি আমাকে চোদ্দ বছর বয়সেই হাতাখুন্তি ধরিয়ে কোন সৎপাত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া না বেঁধে দিয়ে ইশকুল কলেজে পড়াচ্ছেন, সকলের সঙ্গে মিলতে মিশতে দিচ্ছেন, অবরোধ প্রয়াশ বিশ্বাস করেছেন না এবং সারাক্ষণ বলছেন তুই আমার ছেলেমেয়ে দুই-ই, সেই ক্ষেত্রে এমন লোক কেন খুঁজছেন যে আমাকে বসিয়ে খাওয়াতে সক্ষম ? আমি কি অবলা যে বসে খাবো ? বিয়ে হলে স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের ভার নামক বস্তু যদি স্বামী নামক একজনের উপর প্রযোজ্য হয় তা হ'লে সেই ভার একজন স্ত্রীরও নেওয়া উচিত যদি তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করা হয়। এতোদিনে আমি বুঝতে পারলাম, যতোই সহপাঠী হই না কেন, বয়সে সমানই হই না কেন তুমি আমাকে একজন মেয়ে ছাড়াও যেমন আর কিছু ভাবো না, তেমনি অধিনস্ত ছাড়াও আর কিছু ভাবো না।

মোক্ষম জায়গায় আঘাত পড়লো সন্দীপের। সব সময়ই সে বড়াই করে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা তার অভ্যেস নয়, আর সেটা প্রমান করতে সে এতো উদগ্রীব যে আমার নামে চিঠি এলেও কখনো খোলে না। আমি কিন্তু খুলি। আমি বলি দাঁড়াও দাঁড়াও দেখি, ফাঁকি দিয়ে প্রেমপত্র লেখালেখি করছো কিনা।

ছেলেরা মেয়েদের সত্যি সত্যি অধীন ভাবে বলেই এইসব দেখানো পনা বাড়াবাড়ি করে। আমি সন্দীপের কথা বলছি না সন্দীপ সত্যি অন্যরকম মানুষ, ওর হৃদয়ের কোনো তুলনা নেই তবে হাজার হাজার বছরের পুরুষ শাসিত সমাজে ব্রেক কষতে কষতে ও যেমন গাড়ি অনেক দূর চলে যায় তেমনি অতি উদার মনের পুরুষের অন্তরেও একটা দেয়াল থাকবেই থাকবে। সে দেয়ালটা সন্দীপও সরাতে পারছিলো না। শুধু বিপদ আপদের ভয়েই যে আমাকে ছাড়তে পারছিলো না তা নয়। তার মনস্তত্ব আরো অনেক ভাবে তাকে বিধ্বস্ত করছিলো।

একজন মহিলা কী কী কাজ করবে বা করবার যোগ্য এ বিষয়ে আর সকলের মতো ওরও একটা ছক কাটা ধারনা ছিলো। স্ত্রীরা কী কী করলে পদস্থ স্বামীকে অসম্মানিত হ'তে হয় না তারও একটা গতানু-গতিক চিন্তা থেকেও মুক্ত ছিলেন না। এ ব্যাপারে আমার এই আগ্রহ যদি ওর সঙ্গে ঘিরে ঘিরে হ'তো তাতেও খুশি হতো কিন্তু ওকে ছাড়িয়ে হোক সেটা ভালো লাগলো না। ফলে বেশ কথা কাটাকাটি হলো। 'মেয়ে হয়ে জন্মেছ মেয়ের মতো থাকো।' এ কথাও বললো কিন্তু আমি অস্থির হলাম না, বিরত হলাম না, অদম্য উৎসাহে, ওর সমস্ত আপত্তি দু'হাতে ঠেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলাম এবং ঠিক চারদিন বাদেই ফিরে এলাম এবং ফিরে এসে বললাম, আমি সুলতা মিত্রের খুনীকে সনাক্ত করেছি।

১২

এতোক্ষণ এই গল্প রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলেন সুমিত্রাদেবী। এই বার চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'সত্যি তুমি খুনীকে সনাক্ত করতে পেরেছিলে ইন্দ্রানী', কী আশ্চর্য। কে?

ইন্দ্রানী মুখার্জি সহাস্যে বললেন, 'আপনি বলুন তো কে হতে পারে?'

সুমিত্রাদেবী বললেন, 'আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। বলুন তো'?

'সেই সুহৃদ বটব্যালেদের আত্মীয় লোকটা যার গলার জোর সে বাড়ীতে সবচেয়ে বেশী ছিলো। বলো ঠিক কিনা।'

ইন্দ্রাণী মুখার্জি তাঁর সহকারী অমৃতার দিকে তাকালেন, একে আমি কোথায় পেয়েছি জানেন?'

'কোথায়?'

'একটা ট্রেনের কামরায়।'

কোথায় যাচ্ছিলে?

'কলিকাতা থেকে বর্ধমান।'

'কবে?'

'সেই তখনি।'

'কখন?'

'আমার গোয়েন্দাগিরি হাত খড়ির প্রথম পর্বে। অমৃতা আমাকে আমার জেদ সম্পূর্ণ করতে অর্ধেকের উপরে সাহায্য করেছে। নইলে সন্দীপের কাছে আমার মুখ থাকতো না, নিজের কাছে ও নিজে জন্মের মতো হেরে থাকতাম।'

তুমি তো তখন ছিলে কী এক পার্বত্য শহরে, তার মধ্যে কলকাতা এলো কেমন ক'রে?

সেই দিনই সন্দীপের সঙ্গে ঝগড়া করে তার সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা

ক’রে আমি কলকাতার প্লেন ধরেছিলাম। কলকাতা থেকে বর্ধমান। অমৃতাও বর্ধমানে যাচ্ছিলো একটা স্কুলে কাজ করছিলো ওখানে। আমি তাকে আমার চাকরিটা অফার করলাম।

‘তোমার কী চাকরী ?’

‘এই এখন যা করছি।’

‘তুমি বর্ধমানে কেন গেলে ?

সুলতা মিত্র কে ? শচীন মিত্র কে এবং তিলক চ্যাটার্জিই বা কে এ খবরগুলো জানা দরকার ছিলো ?

‘তাহলে ওরাই খুন করেছিলো।’

করেছে কি করেনি তখনো তো জানিনা। খোঁজ না নিলে জানা সম্ভব নয়।

‘তারপর, তারপব ?’

‘খোঁজ নিয়ে আর একটি দাগী অপরাধীকেও ধ’রে ফেলেছিলাম সেবার। যাকগে সে আবার অন্য গল্প।’

‘কী সাংঘাতিক মেয়ে তুমি।’

‘তখন আমার প্রথম কাজ বলেই আমি অতি সাবধানে পা ফেলছিলাম। তা নৈলে কে খুনী সেটা বুঝতে আমাব বেশী দেরি হয়নি।

‘সত্যিই শচীন মিত্র কি ?’

‘ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? খোঁজ খবর নিতে দিন।’ প্রমাণসাপেক্ষ হওয়া চাই তো ? যাদের বা যাকে ধরবেন আর যাদের বা যাকে মুক্তি দেবেন দুই পক্ষকেই তো ভালো করে জানতে হবে।’

‘তাই তো তাই তো।’

‘শচীনবাবু আর তার স্ত্রীর সম্পর্কে অনেক গুজব ছিলো আমাদের শহরে। তার সত্যাসত্য যাচাই করতেই আমার বর্ধমানে আসা। পত্নী না হ’য়ে উপপত্নী হ’লে কিম্বা পতি না হ’য়ে উপপতি হ’লে তাদের সংশ্রব অনেক সময়ই বড়ো আক্রোশের হ’য়ে ওঠে। তার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি জুটলে তো সোনায় সোহাগা।’

তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?'

'সেই তিলক চ্যাটার্জি।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর?'

'সব খবর আমাকে অমৃতাই এনে দিল। অমৃতা যে স্কুলে কাজ করছিলো এক সময়ে সুলতা মিত্র ও সেই স্কুলে কাজ করতেন।'

'সুলতা মিত্র তাহলে সত্যি বর্ধমানের মেয়ে?'

না বর্ধমানের মেয়ে নন, বলতে পারেন ভাসতে ভাসতে এসেছিলেন। মেয়ে উনি পূর্ববঙ্গের, ওঁর বাবা ঢাকা শহরে ডাক্তারি করতেন। বড়ো ডাক্তার, লম্বা ফী অতিশয় চাহিদা। দেশ ভাগ হ'য়ে যাবার পরেও কলকাতায় এলেন না, ওখানকার লোকেরাই তাঁকে সাবধানে রেখে নিরাপদে রেখে আসতে দিল না। উনি ছিলেন দরদী ডাক্তার সবাই ভালোবাসতো। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বিনা পয়সায় ওষুধ দিতেন দেখতেন, দরকার হ'লে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতেন। সুলতা মিত্র তাঁর একমাত্র সন্তান। ঢাকা থেকেই বি, এ. পাশ করেছিলো, এম, এ পড়ছিলো, এই সময়ে আবার দাঙ্গা শুরু হ'লো। ওখানকার স্থানীয় লোকেরাই বললো, ডাক্তার সাহেব, এবার সব বাইরে থেকে অবাঙালী এসে দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। আমরাই ভরসা পাচ্ছি না। আপনি পরিবার নিয়ে চলে যান কোথাও। হাঙ্গামা থামলে আবার চলে আসবেন। যে রকম গরম দেখছি, শহর নিরাপদ মনে হচ্ছে না।'

একথা শুনে ডাক্তার একটু বিচলিত হ'লেন। কিন্তু তক্ষুণি সব তুলে দিলেন না। বললেন, 'আমি না হয় অবস্থা বুঝে তোমাদের কারো বাড়িতে থেকে যাবো কয়েকদিন, ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু সুলতার মা বললেন, 'তোমাকে একা ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। বরং মেয়ে চলে যাক। তুমি গুছিয়ে নাও, একসঙ্গে যাবো।'

ডাক্তার অনেক বোঝালেন তিনি শুনলেন না। ঠিক করলেন,

স্বামীকে নিয়ে চিরকালের মতোই ঢাকা ছাড়বেন। তার আগে মেয়েকে তুলে দিয়ে এলেন প্লেনে। একজন পরিচিত লোক যাচ্ছিলো, তার সঙ্গে সুলতা চলে এলো কলকাতা। দুঃসম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠলো। জ্যাঠামশায়ের অবস্থা ভালো নয়, কায়ক্লেশে থাকেন, অচেনা ভাইঝিকে খুব সুনজরে দেখার কথা নয়। কিন্তু ভাইয়ের পাঠানো একখানা লম্বা খামের ভিতরে কন্যার খরচ বাবদ নীলচে নীলচে নোটে এতো অনেকগুলো কাগজ তিনি দেখতে পেলেন যে মনে হ'লো ঈশ্বর যখন দেন এরকম ছাপ্পর ফুঁড়েই দেন। সুতরাং ভাইঝির সমাদৃত হ'তে কোনো বাধা হ'লো না।

জেঠিমা দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, ভাই দু'টি বোমা বানানো প্র্যাকটিস করতেই সারাদিন ব্যস্ত। উপরের দুই মেয়ে বিবাহিত। একজন মধ্যপ্রদেশে থাকে আরেকজন বিহারে। স্যাঁতস্যেঁতে এক বিশ্রী বাড়ি, বিশ্রী পল্লী, বিশ্রী আবহাওয়া সুলতার দম আটকে এলো। কিন্তু কী করে এসে পড়েছে।

খবরের কাগজে রোজই দাঙ্গার খবর বেরোয়, চিন্তা হয়, চিঠিপত্র আসে না ঠিক মতো, ভারাক্রান্ত মনে দিন কাটে। ঢাকার মেয়ে সুলতা কলকাতার পথ-ঘাট কিছুই চেনে না, চিনে নিয়েছে শুধু গলির মুখে পোস্টাপিসটি। মাঝে মাঝেই সেখানে যায় চিঠি এসেছে কিনা খোঁজ নিতে অথবা খাম পোস্টকার্ড কিনতে। একজন মহিলা যেচে আলাপ করলেন তার সঙ্গে। সেই মহিলাই সংবাদ দিলেন, চিঠির আশা বৃথা, 'ঢাকার অবস্থা অবর্ণনীয়, সকল হিন্দুই যে যে ভাবে পালিয়েছে সেখান থেকে। তাঁর একজন এমন লোকের সঙ্গে চেনা আছে যে নিতান্ত দুরূহ খবরও এনে দিতে পারে। সুলতা ব্যাকুল হয়ে বললো 'আমার খবরটাও তাঁকে এনে দিতে বলুন মাসিমা। আমার বাবার এই নাম, এই পাড়ায় থাকেন, এই ঠিকানা।'

মহিলা বললেন, 'তুমি বরং আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো,

আমি তোমাকেই তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। যা যা বলবার তুমি নিজেই তাকে বলতে পারবে।'

সুলতা একবাক্যে রাজী। জিজ্ঞেস করলো, 'আজই যদি যাই দেখা হতে পারে কি?'

মহিলা বললেন, 'নিশ্চয়ই। সে তো আমার বাড়িরই ভাড়াটে।'

'তবে চলুন।' ব্যস্ত হ'য়ে সুলতা তখুনি তাঁর সঙ্গ ধরলো। বাসে ক'রে মহিলা যে তাকে নিয়ে কোথায় কোন পথে এসে নামলেন সেটা তার বোঝবার কথা নয়। সে তো কিছুই চেনে না। নেমে রিকসা নিলেন। এগলি সেগলি ঘুরে রিকসা একটি পুরোনো বাড়ির দরজায় থামলো। সারা পাড়াটাই পুরোণো শ্যাওলা ধরা। বাড়ির পাশে পাশে নর্দমা। মহিলার সাজ-পোষাকের সঙ্গে সে পাড়াটা ঠিক মেলানো গেলো না।

সরু সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন তিনি তারপর একটি ঘরে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে দিলেন।

১৩

পুরো একদিন-একরাত সে সেখানে ছিলো। এটা কী ধরণের নরক সেটা বুঝতে মাত্রই কয়েক মিনিট লেগেছিলো। যে লোকটি দরজা খুলে বুবুক্ষুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো। এসে তাকে নখে দাঁতে ছিঁড়ে দিয়ে সে উন্মাদের মতো আচরণ করছিলো। হয়তো সাময়িকভাবে পাগলই হ'য়ে গিয়েছিলো। মনে আছে মহিলা প্রহারে প্রহারে তাকে জর্জরিত করেছিলো। সেই প্রহার কিন্তু তার দেহকেই আঘাত করছিলো, তার বোধশক্তিতে নয়। সে ঘরের জিনিশপত্র ভেঙে ছিঁড়ে যাকে সামনে পাচ্ছিলো তাকেই আঁচড়ে কামড়ে এমন এক উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে তুললো যে তার ভয়হীনতা দেখে

তারাই ভয় পেয়ে গেল। তারপর কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। এক ছুটে গলি পেরুলো, রাস্তা পেরুলো, কোথায় কোন্ দিক দিয়ে যে চকিত হরিণের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এসে স্টেশনে পৌঁছুলো নিজে ও জানে না। তার মন কীভাবে কাজ করছিলো তা-ও জানে না। ভিতরে ঢুকে কোনো এক প্ল্যাটফর্মের কোনো এক দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের কোনো এক ভীড়াক্রান্ত কামরায় উঠে বসলো নিঃশব্দে।

সেইখানেই তার শচীন মিত্রর সঙ্গে পরিচয়। টিকিট চেকার এলে সচেতন হয়ে যখন সে তার সমস্ত অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে কান্নারক্ত রক্তজবার মতো চোখ তুলে ভয়ে ভয়ে এর ওর মুখে তাকাচ্ছিলো, সেই সময় শচীন মিত্রই উল্টোদিকের বেঞ্চি থেকে তাকে একখানা বর্ধমানের টিকিট কেটে দেন।

কেটে দিয়ে জনান্তিকে বলেন, আপনি কোথায় যাবেন। আমি জানি না, আমি নিজে বর্ধমানে নামবো। মনে হচ্ছে আপনি বিপন্ন। সংকোচ করবেন না। যদি কোনো সাহায্যের দরকার হয় নিঃসঙ্কোচেই বলতে পারেন।

সুলতা মিত্র সব কথা নিঃসঙ্কোচেই বলেছিলেন, শচীন মিত্র তাঁকে সর্বোতোভাবে সাহায্যও করেছিলেন। বলেছিলেন আমি ও পূর্ব-বাংলার ছেলে, সব হারিয়ে এখন এই বাংলায় আছি। আপনার দুঃখ আর আমার দুঃখ ভিন্ন নয়।

বর্ধমানে পৌঁছে সুলতা তার হাতের বালাটা খুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'এটা বিক্রী ক'রে আমাকে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে দিন কোথাও থাকতে হবে তো? তার বন্দোবস্তও আপনাকেই ক'রে দিতে হবে!'

অবাক হ'য়ে শচীন মিত্র বলেছিলেন, 'আশ্চর্য তো, বালাটা ওরা খুলে নেয়নি!'

ম্লান হেসে সুলতা বলেছিলেন, 'বোধহয় সময় পায়নি। খুনোখুনি ক'রে একদিনের মধ্যেই তো পালালাম?

শচীন মিত্র বললেন, 'আপনি আর আপনার জ্যাঠামশায়ের বাড়ি ফিরে যেতে চান না?'

'চাই না সেটাও সত্য, আবার এও সত্য যে চাইলেও বাড়িটাতে চিনে যেতে পারবো না।'

'ঠিকানা তো জানেন?'

'নম্বর মনে নেই। এঁরা সবাই আমার কাছে নতুন। অনোন্যপায় হ'য়ে মা বাবা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মাত্র দশদিন এসেছি এর মধ্যেই এই কাণ্ড।'

'কিন্তু সেখানে না গেলে তো আপনার মা বাবার খোঁজ পাওয়া কঠিন হবে।'

'জানি। কিন্তু গেলে আমি আবার এই ধরণের বিপদে পড়বো। জ্যাঠামশায় বৃদ্ধ, উপরন্তু দারিদ্র তাকে স্বার্থপর ক'রে ফেলেছে। জেঠিমা শয্যাশায়ী, ভাই দু'টি খবরের কাগজের ভাষায় সমাজ বিরোধী, হেন অপকর্ম নেই করতে অক্ষম, আমার বিপদ শুধু বাইরেই নয়, ঘরেও আছে। ভাইদের বন্ধুরাও অমলিন দৃষ্টিতে তাকায় না, তাদের আসা যাওয়া বেড়ে গেছে ও বাড়িতে। আমি সেখানেও ভয়ে ভয়ে থাকতাম।'

'ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো আপনার মা বাবার খোঁজ নিতে। আর একটা কথা, গয়না-টয়না কোথায় কীভাবে বিক্রী করা যায় আমি তো ঠিক জানি না বরং আমি কিছু টাকা ধার দিতে পারি, কয়েকটা দিন কোন বোর্ডিং টোর্ডিংয়ে থেকে চালান, এখানকার স্কুলে কাজ খালি আছে একটা, আমার এক বন্ধুর বাবা সেই স্কুলের গবর্নিং বড়িতে আছেন, তাঁকে বলে মনে হয় কাজটা হ'য়ে যাবে। ওরা

ভালো মেয়ে পাচ্ছেন না। আপনি ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছেন তো?'

'হ্যাঁ, এম, এ,'ও পড়েছি দু'বছর, শুধু পরীক্ষাটা দেবারই সময় হ'লো না।'

'ঠিক আছে বালা রেখে দিন, কাজ হ'লে আস্তে আস্তে আমার ধার শোধ ক'রে দেবেন।'

কাজটা ওঁকে করে দিয়েছিলেন শচীন মিত্র। এই তিলক চ্যাটার্জির বাবাই ছিলেন গবর্নিংবডির মেম্বার।

সুলতাকে শচীন মিত্র নিজের সম্পর্কিত বোন ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন। এসব উপকার শচীন মিত্র নিতান্তই একটি বিপন্ন মেয়েকে সাহায্য করতেই করেছিলেন, নিতান্ত নিঃস্বার্থ ভাবেই করেছিলেন, পরিচিত লোকেরা সবাই জানতো সুলতা তার বোন।

যার বেশীর ভাগ টাকায় মেয়েদের জন্য এই হাইস্কুলটি তৈরী হ'য়েছিলো তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর অবর্তমানে তার ছেলেই ছিলো তখন কর্তা। এই ছেলের নেক নজরে পড়েই আবার দুর্দিন ঘনিয়ে এলো সুলতার। তবু বছরখানেক বেশ ভালোভাবেই কেটেছিলো। ইতিমধ্যে লোক পরম্পরায় এই খবরও সুলতা জেনেছে তার পিতাকে ওরা কেটে ফেলেছো মা নিরুদ্দেশ। নাম ধাম সব জেনে নিয়ে শচীন মিত্রই খবরটা পেয়েছিলেন। প্রথম কিন্তু জানাতে চায়নি সুলতাকে। শচীন মিত্র সপ্তাহে তিনদিন বর্ধমানে পড়াতে আসতেন। আসতেন কলকাতা থেকে। কলকাতাই তাঁর বাসস্থান। যখন আসতেন সময় পেলেই খোঁজ নিতেন সুলতার। কিন্তু একথাটা বলতে পারেননি নিষ্ঠুর হ'য়ে।

সেক্রেটারি ব্রজবল্লভ পালকে সুলতা খুব কম দিনই দেখেছেন তার

চাকরির এক বছরের মধ্যে। অনেক শিক্ষিকার মধ্যে সুলতাও একজন সুতরাং ব্রজবল্লভের সঙ্গে দেখাশোনা হবার মতো কোনো কারণ থাকতো না। তাছাড়া ব্রজবল্লভ ইশকুলের ব্যাপারে বেশী মাথা গলাতো না। যেহেতু তার বাবার টাকার সিংহভাগেই এই ইশকুল তৈরী সেইজন্যেই তাকে সেক্রেটারি ক'রে রাখা হ'য়েছিলো। হেড্ মিষ্ট্রেস হৈমবতী বিশ্বাসই সর্বেসর্বা। মাঝে মাঝে তিনিই দরকার মতো যেতেন এবং সব মিটিংয়ে ডাকতেন। কোনো এক সময় হৈমবতী অসুস্থতার দরুণ মাস দু'য়েকের ছুটি নিয়ে বিশ্রামে ছিলেন যোগ্য বিবেচনায় হৈমবতী সুলতা মিত্রকেই তার কর্মভার ন্যস্ত ক'রে যান। সেই সূত্রেই তাঁর ব্রজবল্লভের সংস্পর্শে আসতে হয়।

সুলতা মিত্রকে আমি তো অনেক দেখেছি তাঁর রং ফর্সা ছিলো না বটে কিন্তু অপূর্ব মুখশ্রী। টানা টানা চোখ দু'টি দেখলেই তাকিয়ে থাকতে হয়। ব্রজবল্লভের অভ্যাস প্রায় পঞ্চাশ দেহের ভারে হাঁসফাঁস করতে থাক' হৈমবতীকে দেখা, হঠাৎ এই বিদ্যুৎপর্ণাকে দেখে জিবে জল এলো। দু মাসের মধ্যে প্রায় প্রত্যহ তার ইশকুলে আসার দরকার হ'তে লাগলো, এবং সুযোগ সুবিধে মতো একদিন প্রেম নিবেদনও ক'রে ফেললো। বললো, বর্ধমান শহরে আমার প্রতাপ-প্রতিপত্তির সীমা নেই, বাড়িটা দেখিয়ে আনবো বাগান পুকুর নিয়ে রাজপ্রাসাদ, সংসারে ঝক্কি ঝঞ্ঝাটও কিছু নেই। বিয়ে করলে রাণীর আদরে রাখবো।'

সুলতা ভীতচকিত হ'য়ে 'এসব কী বলছেন . এসব কী বলছেন, বলে ফিরে এলো। কিন্তু বিপত্নীক ব্রজবল্লভ তাকে ছাড়লো না। আঁঠালির মতো লেগে রইলো। হৈমবতী এসে জয়েন করলেও দেখা গেল তার মতিগতি একই রাস্তা বেয়ে চলেছে। এবং কিছুদিনের মধ্যে হৈমবতীও এই বিয়েতে সম্মতি দেবার জন্য বলতে লাগলো বারে বারে। 'শুধু তাই নয়, সুলতাকে রাজী করাবার জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লাগলো। তারপর একদিন তারই ষড়যন্ত্রে হ'য়ে গেল বিয়ে।

হৈমবতী বলেছিলেন, একটা পুজো হচ্ছে সেক্রেটারীর বাড়িতে, তাদের নিমন্ত্রণ করেছে, যেতেই হবে।

প্রথমে সুলতা না যাবার অনেক ওজর আপত্তি জানিয়েছিলো। সেক্রেটারির বাড়ি শুনেই যাবার ইচ্ছে তার উবে গিয়েছিলো। হৈমবতী নরমে গরমে অনেক কিছু বলে রাজী করালেন। সুলতা ভাবলেন যাচ্ছি তো দু'জন একসঙ্গে ভয়ের কী থাকতে পারে? তবু ব্রজবল্লভের লালায়িত চেহারাটা ভাবলেই তার দম আটকে আসে। কিন্তু উপায় নেই। হৈমবতী হেডমিসট্রেস, তার কথা অমান্য ক'রে এখানকার চাকরি বজায় রাখা নিশ্চয়ই শক্ত হবে। চাকরি গেলে আশ্রয় কই? একজন মহানুভব ব্যক্তির দয়াতেই এই ভদ্রজীবনে বহাল হ'তে পেরেছে বিতাড়িত হ'লে কোথায় যাবে?

হঠাৎ শচীন মিত্রর উপর অভিমানে মনটা তার ভারি হ'য়ে ওঠে। উপকার করাটাই কি সব? মানুষে মানুষে কী কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে না? কী নিরাসক্ত কী উদাসীন। ন' মাসে ছ' মাসে একবার আসেন, বাক্যালাপ এই রকম: শচীনবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'ভালো আছেন?'

সুলতা বলেন, আপনি ভালো আছেন?'

তিনি বলেন, 'শরীর আমার সব সময়েই ভালো থাকে।'

সুলতা বলেন, "কেন, মানসিক ভাবে কি কোনো—'

এবার হাসেন তিনি, বলেন, 'সেই রহস্যসময় জগতের কথা থাক। স্কুলের কাজ, কেমন লাগছে বলুন।'

'মন্দ কী—?'

'আপনাকে বোন বলে পরিচয় দিতে হ'য়েছে, সেজন্য কিছু মনে করেননি তো?'

'নিরুপায় হ'লে মিথ্যেটা মিথ্যে থাকে না।

'আমাদের দেশে, বিশেষও এই ধরনের মফঃস্বল শহরগুলোতে স্ত্রী-পুরুষের বন্ধুতায় বিশ্বাস করে না। সেটা সন্দেহের চোখে

দেখে, কাজটা হয়তো হ'তো না তা হ'লে।'

'সেই তো। না হ'লে আমি কী করতাম ভাবলে বুক হিম হ'য়ে যায়।'

এখানে শচীন মিত্র আবার হাসেন, 'আপনাকে পথে ছেড়ে দিয়ে আমি দায় এড়াতাম, তাই না ?'

'তা হ'লে কী করতেন ?'

'উল্টো ক'রে ভাবুন না, ধরুণ আপনি আমি, আমি আপনি। আপনি কী করতেন ?'

'আমি ?' এখানে সুলতাও সহাস্য হয়, 'আমি অত পরার্থপর নই।'

'তাই নাকি ?' শচীন মিত্রর চোখের তারা ঝকঝক করে।

সুলতা চোখ নামিয়ে নেন।

এবার হাতের সিগারেটটা অর্ধজ্বলন্ত অবস্থাতেই এ্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, 'এবার যাই।'

'এখুনি ?'

'দরকার হ'লেই আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আমার কলেজের সময় তো আপনি জানেন, কী কী বারে আসি তাও জানেন। ইশকুলের দারোয়ানকে দিয়ে একটা চিরকুট পাঠালেই আমি চলে আসবো।

এগিয়ে দিতে দিতে সুলতা মৃতুস্বরে বলেন, 'দরকার ছাড়া কি ডাকা নিষেধ ?'

শচীন মিত্র ফিরে তাকাল, ততোধিক মৃতুস্বরে বলেন, সে ভাগ্য কি কখনো হবে ?

এগুলো কথার পৃষ্ঠে কথা, তাই সুলতাও কখনো ডাকেন না, শচীনবাবু ও আসেন না। সুলতা ভাবেন, ইচ্ছে থাকলে মানুষ নিজেই আসে, তাকে কি কখনো সেধে যেচে ডেকে আনতে হয় ?

শচীনবাবু ভাবেন, না ডাকলে কি কখনো যাওয়া যায় ?

অকারণে ঘন ঘন গেলে নিশ্চয়ই মনে করবেন তিনিও উপকারেরা ছদ্মবেশে একজন লোভীপুরুষই মাত্র।

এই চিন্তায় টানাপোড়েনে দু'পক্ষই সহজ হতে পারেন না কিন্তু আকর্ষণ বাড়ে। চোখের দেখা না হলেও মন এসে অপরের সঙ্গ প্রার্থনায় অবিশ্রান্ত ঘুরপাক খায়।

১৪

হৈমবতীর সঙ্গে সেক্রেটারির কী চুক্তি হ'য়েছিলো স্থলতা জানেন না, নিশ্চয়ই টাকার লোভেই সে এই ভয়ানক অন্যায় কাজটি সম্পন্ন করতে তাকে পুজোর নাম করে নিয়ে এসেছিলো সেক্রেটারির বাড়িতে। হৈমবতী আগে অনেক এসেছে, স্থলতা এই প্রথম এলেন। বাড়িটা দেখে সত্যি তার ভালো লাগলো। অনেক জমি অনেক গাছ, মস্ত পুকুর—ব্রজবল্লভ মিথ্যে বলেনি, সব নিয়ে পুরোনো ধরণের অট্টালিকাটি বস্তুতই প্রাসাদ।

ব্রজবল্লভের বাবা বিশ্ববল্লভ তেলের ব্যবসাতে বড়ো লোক। ব্রজবল্লভ সেই সঙ্গে লোহালক্কর জুড়ে আরো বড়োলোক হয়েছে।

যে ঘরে পুজো হবে বলে হৈমবতী তাকে নিয়ে এলো মাত্র একজন পুরুষই উপস্থিত ছিলো সেখানে। আর কোনো লোক ও যেমন চোখে পড়লোনা, পুজোর ও কোনো আয়োজন নেই। কেবল একটি ঘট পাতা আছে ঘরের মধ্যিখানে। তার পাশে দু'টি আসন পাতা। হৈমবতী তারই একটি আসনে তাকে বসিয়ে দিলেন।

স্থলতা ইতস্তত ক'রে বসতে বসতে বললো, 'এখানে কেন বসবো ?'

হৈমবতী বললো, 'পুজোর নিয়মে প্রথমে একজন কুমারী পুজো করতে হয়। আসল পূজা পরে।

বলতে বলতেই পুরুৎ হাতে স্থতো বেঁধে কী বিড়বিড় করলো

তারপরেই ব্রজবল্লভের আবির্ভাব। এসেই সে পাশে বসে চকিতে সিঁদুর লেপন করলো সুলতার মাথা কপাল ভ'রে।

ঘটনাটা এমন অতর্কিতে ঘটে গেল যে এর আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো সুলতা। চকিতে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলে উঠেছিলো, 'এ সব কী?'

হাসিমুখে হৈমবতী দরজার বাইরে চলে যেতে যেতে বললো. কী আবার। কপাল করে এসেছো রাজরানী হবে, তাই হ'লে। আসি তা হ'লে।

'কী অন্যায়! কী অদ্ভুত! আমি এসব মানিনা, মানিনা বলতে বলতে ক্রন্দনমুখী সুলতা ও ছুটে গিয়েছিলো দরজার দিকে, ব্রজবল্লভ ছিটকিনি বন্ধ ক'রে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো। বললো, তুমি এখন আইনসঙ্গত ভাবেই আমার স্ত্রী। তার সাক্ষী পুরুৎ, সে মন্ত্র পড়িয়েছে। হৈমবতী দাসের সাক্ষাতে আমি তোমাকে সিঁদুর পরিয়েছি, তারপরেই গদগদ ভাবে দু'হাত বাড়িয়ে দিল, প্রবল শক্তিতে জাপটে ধরে বুকের মধ্যে পিষতে পিষতে বললো 'এখন আমি তোমার স্বামী, বুঝলে?

সুলতা মূর্ছাহত হ'য়ে ঢলে পড়লো।

বলাই বাহুল্য এরপরে সুলতাকে মেনেই নিতে হয়েছিলো সেই স্বামীত্ব, স্বামীর গৃহবন্দী ও হ'তে হ'য়েছিলো জন্মের মতো। কিন্তু জন্ম সে যে সেখানে কাটায়নি তাতো দেখতে পেলাম পরে।

সুমিত্রাদেবী বলে উঠলেন, 'ও, তার মানে যা রটে তা কিছু কিছু বটে?'

'হ্যাঁ।'

'শচীন মিত্রই নিয়ে পালিয়েছিলেন? কম লোক'তো নয়।'

'না, কোনোদিক থেকেই কম লোক নন তিনি, ইন্দ্রানী মুখার্জি হাসলেন 'ছ মাস বাদেই সুলতামিত্র ব্রজবল্লভের বাড়ি থেকে নিখোঁজ

হয়ে যান। ব্রজবল্লভ পুলিশ ডেকে পুকুর খুঁজিয়ে, লোক লেলিয়ে তোলপাড় করে ফেলেছিলো শহর, কোথাও পাওয়া গেল না।'

সুমিত্রাদেবী বড়ো বড়ো চোখ করে বললেন, বাংলা মুলুক ছেড়ে তাই ঐ শহরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছিলো।'

তারপর? ধরা পড়লো কী ভাবে?'

'ধরা আর পড়লো কই? দৈবাৎই তিলক চ্যাটার্জি এখানে বদলি হয়ে না এলে চেনাজানা কোনো বাঙালীই এদের অস্তিত্ব টের পেতো না।'

ঐ দ্যাখো, আমি ঠিকই ধরেছি, যাই হোক অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ হলে শেষ পর্যন্ত খুনজখম তো হবেই। এবার তিলক চ্যাটার্জির কথাটি বলো দেখি, সেই ভদ্রলোক তখন কোথায় ছিলো?'

কখন?'

'যখন সুলতা মিত্র পালালো?'

'বিলেতে।'

তাহলে জবানবন্দীতে সত্যি কথাই বলেছিলো?'

'তা বলেছিলো।'

'দুই পুরুষ আর এক মেয়ে চিরাচরিত গল্প। এখন কোন পুরুষটি খুনী সেটা বার করাই হবে আসল কাজ। বলো বলো কিভাবে বার করলে সেটা।

ইন্দ্রাণী মুখার্জি হেসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন, সূর্যদেব একেবারে প্রচণ্ড তেজে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের মধ্যস্থলে, জল ঝক্‌ঝকে তলোয়ার। উত্তাল হাওয়ায় তার স্পর্শ। বললেন, 'সুমিত্রাদি বেলা বেড়েছে এখন এ গল্প থাক, আপনি আপনার সংকটের কথাটা বরং বলুন।'

সুমিত্রাদেবী বললেন ইন্দ্রাণী, খুনের গল্পের টান আমার নিজের সংকটকে ছোটো করে দিয়েছে। আর তাছাড়া বিখ্যাত ইন্দ্রাণী মুখার্জি যার ছোটো বোনের মতো তার আর ভয় কী? আমি ঠিক জানি তুমি

আর অমৃতা আমাকে শীগ্‌গিরই উদ্ধার করবে। ভুতের বাড়ি বলে পরিত্যক্ত বাড়িটি আব ভুতের দৌরাত্মে মৃত হ'য়ে পড়ে থাকবে না। অবশ্য এখন সকলেরই চান খাওয়ার সময়। হাতের ঘড়ি দেখলেন, ওমা বারোটা। ছি, ছি, ছি, আমার সেই অতিথিটি নিশ্চয় ভাবছে, আমি কী অভদ্র। কিন্তু শুধু একটা কথা বলে দাও, সত্যিকারেব খুনীটি কে দুই প্রেমিকের মধ্যে ?

'আপনি ভেবে বাব করুন না। ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙ্গলেন।

সুমিত্রাদেবীও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, আমি অনেক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়েছি ছেলেবেলায়। এক সময়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতাম। তোমার খুনের কেসটাতে একটা সুবিধা এই যে মাত্র দুজন মানুষেব মধ্যে বেছে বার করা ; এক একটা গল্প তো কতো অসংখ্য চরিত্র আসে, ভাবতেই পারা যায় না কে।'

ইন্দ্রাণী বললেন. 'এখানে ও ধীলন আছে,' রাম আছে, অন্য তিনটে বাঙালী পরিবার আছে।'

'তারা আর এ ছবিতে কোথায় ?'

অন্তত ধীলন তো থাকতে পারে ?'

'সে থাকবে কেন ? তার কী স্বার্থ ?'

'টাকা।'

'কিসের টাকা ?'

'বারে, শচীন মিত্র ছেচল্লিশ হাজার টাকা এনে ঘরে রেখেছিলেন না ?'

ওটা মিথ্যে কথা।' ইন্দ্রাণীদেবীর মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে বললেন, জানি সময়ে সবই তুমি উদ্ঘাটিত করবে। তবে তোমার এই স্বামী লোকটিও নিতান্ত বোকা নয়। আমিও আমার ইনট্যুইস খাটাবো বাড়ি গিয়ে।'

পর্দা সরিয়ে বাইরে এলাম, 'একটা অনুরোধ করবো ?

'বলুন।'

আজ রাত্রে তুমি আর অমৃতা আমাব ওখানে খা.ব?'

'আজ থাক।'

'এসোনা লক্ষ্মীটি। গল্পটা আমাব ওখানেই বসেই শেষ কববে অতিথিকে ফেলে সকালে বিকেলে দু'বেলাই যদি তোমার কাছে এসে বসে থাকি সেটা কি ভালো দেখাবে?

ইন্দ্রাণী হেসে অমৃতার দিকে তাকালেন, 'তুমি কী বলো অমৃতা?'

অমৃতা ইতস্তত করে বললো চলুন তাই যাই। ওঁদের ভূতেব বাড়িটাও দেখে আসা যাবে।'

এবাব ইন্দ্রাণী মুখার্জি শব্দ কবে হাসলেন, দেখছেন তো এর মধ্যেই ও সত্যানুসন্ধানে লেগে গেছে। বেকাব আছে তো এসে থেকে আর ভালো লাগছে না। আমি বিশ্রাম চাইলে কী হবে, ও তো চায় না।

'খুব ভালো খুব ভালো। অমৃতাব পিঠে চাপ দিলেন সুমিত্রাদেবী 'সবচেয়ে ভালো আমার কপাল। নইলে এমন দুটি রত্নকে এভাবে পেয়ে যাই? তাহাল এখন আসি?

চলে গেলেন তিনি। তাঁব পথের দিকে তাকিয়ে থেকে খানিক বাদে দবজা বন্ধ করে দিল অমৃত।

অমৃতার বয়েস যাই হোক, দেখতে কাঁচা। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন একুশ ছিলো। বিয়ে হয়েছিলো বি, এ, পড়তে পড়তে, বিয়ের পর পরীক্ষা দিয়ে পাশ কবলো তারপর বি, টি, ও পাশ করলো এবং পাশ করে বিজ্ঞাপন দেখে এই চাকরিটা পেলো। স্বামী ইনকাম ট্যাকসে চাকরি করতো, সুন্দর সুঠাম এক তরুণ যুবা। অবস্থা তেমন ভালো নয়, কিন্তু শখ ছিলো, সন্তোষ ছিলো, প্রেম ছিলো। মারা গেল একেবারে হঠাৎ। কী যে হ'লো একেবারে বুঝতে না বুঝতেই চলে গেলো একদিন। শ্বশুর ছিলেন না, শাশুড়ী ছিলেন। এক ভাশুরও ছিলেন, তাঁরা গ্রামে থাকতেন। তাঁরা আর কোনো

সম্পর্ক রাখতে চাইলেন না ওর সঙ্গে। মামাবাড়িতে প্রতিপালিত মেয়ে আবার চলে গেল মামাবাড়িতে। কিন্তু ঠিক মানুষটির সঙ্গে দেখা হতে দেরী হ'লো না। সেই ঠিক মানুষ তার এই দিদি, ইন্দ্রাণী মুখার্জি। আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই টান অনুভব করেছিলো; সঙ্গে সঙ্গেই একমত হয়ে গিয়েছিলো, এই খুনের রহস্য ভেদ করতে অমনি সাহায্যে লেগে যেতে দেরি করেনি।

অবশ্য তখনি যে চাকরি ছেড়ে মামাবাড়ির আশ্রয় ছেড়ে সে চলে গিয়েছিলো তার সঙ্গে তা নয়। গিয়েছিলো অনেক পরে। কিন্তু চিঠি লেখালেখি ছিলো। কোনো কারণে অপমানিত হয়ে এই মাষ্টারির কাজটা ছেড়ে দিতে হয়েছিলো তার। কিন্তু যার নেই বলতে কেউ নেই কিছু নেই তার তো বসে খাওয়া চলে না। মামার ছ'টি ছেলে মেয়ে, তাদের নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত, বোঝার উপর শাকের আঁটি এই ভাগ্নিটিকে বহন করতে কষ্ট না হবার কথা নয়। সেই সময়েই সে ইন্দ্রাণীকে চিঠি লিখছিলো ইন্দ্রাণীদি, এই তো অবস্থা, তুমি আমাকে যদি তোমার কোনো কাজে লাগাতে চাও আমি কৃতার্থ হবো।'

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাণী মুখার্জি জবাব দিয়াছিলেন, 'চিঠি পেয়েই টিকিট কাটো, একটা হীরে চুরির ব্যাপারে ব্যস্ত আছি, তুমি এলে আমার মস্তিষ্ক অনেক সহজভাবে কাজ করবে। তাছাড়া সন্দীপ একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি দরকার, সুন্দরী শ্যালিকাটিকে পেলে সে আনন্দে আত্মহারা হবে। সেই সময়ে ওঁরা এলাহাবাদে ছিলেন। অমৃতা আর দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল। তখন থেকেই সে আছে তার সঙ্গে। আর বিয়েও করলো না, মামাবাড়িও ফিরে গেল না। এখনতো তাকে ছাড়া ইন্দ্রাণী মুখার্জির একদিনো চলে না। অমৃতা না থাকলে সে চোখে অন্ধকার দেখে। মেয়ে বড়ো হয়েছে স্বামী তো ঘোরে তার ধান্দায়, এই অমৃতাকে নিয়ে তার সংসার। অমৃতা তার শুধুই কাজের দোসর নয়, তার একক জীবনের সহায়, মা বাবা ভাই বোনের পরিপূরক।

বিকেলবেলা অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরে বসে সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে হাতের ঘড়ি দেখে ঠিক পৌনে আটটায় গিয়ে পৌঁছোলো তারা সুমিত্রা দেবীর হোটেলে। তিনি আছেন দোতলায় একটি ছোটো সুইট নিয়ে, পাশাপাশি দু'খানা ঘর বন্দোবস্ত বেশ ভালো, নতুন তৈরী হয়েছে সমুদ্রমুখী এই হোটেলটি, সুমিত্রাদেবী কিছুকাল যাবত আছেন এখানে যতোদিন না নিজের বাড়ির দখল পান এখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন। হোটেলের মালিক খুব দেখাশুনা করেন তাঁকে, একা মানুষের পক্ষে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয় তাঁর। খাবারটা আসে হোটেলের কিচেন থেকেই তবু তাঁর একটা নিজস্ব ষ্টোভ আছে, নিজস্ব ছোট্ট ঘরও আছে একটা রান্নাঘর নামে, দরকার হলে অনেক সময়েই নিজের চা জল খাবারটা সেখানে তৈরী ক'রে নেন। আবার হোটেলের খাদ্যের অরুচি হলে একদিন আধদিন রান্নাও করেন। দিল্লী থেকে এই অতিথিটি আসার পর থেকে ভাত ডাল তরকারী হোটেলের কিচেন থেকে আনালেও মাছ বা মাংসটা নিজেই আনেন নিজেই রাঁধেন। এটা তার অতিথি সৎকার।

১৫

ইন্দ্রাণী আর অমৃতা অধিকারী এলে সুমিত্রাদেবী আন্তরিক ভাবে জড়িয়ে ধরে তাদের আপ্যায়ণ করে বসালেন। রাকেশ সমাদ্দারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আমি কিন্তু ইন্দ্রাণী তোমার মতো পাকা রাঁধুনি নই। সকালে তুমি তোমার নিজের হাতে তৈরী যা সব চমৎকার খাবার খাইয়েছো, তারপর আমার এখানে কী খাওয়াবো ভাবতেই আমার লজ্জা করছে। আর দেখছো তো অতি ছোটো একটা হোটেল এ্যাপার্টমেণ্ট।

রাকেশ সমাদ্দার হেসে বললেন, 'সুমিত্রাদেবী তাঁর অতি ছোটো হোটেল এ্যাপার্টমেণ্টে বসেই যা চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় কদিন ধরে

খাওয়াচ্ছেন আমাকে, তাতে তো আমি বলবো যে জন্ম জন্ম ধরেই যেন তাঁর অতিথিরা এই ছোটো অ্যাপার্টমেণ্টে এসেই ওঠে। আজ আপনারাও তার প্রমান পাবেন।

সবাই বসলে সুমিত্রাদেবী বললেন, এক রাউণ্ড চা বা কফি হবে নাকি?

রাকেশই বললেন, 'মন্দ কী? মাত্র তো সাতটা পঞ্চান্ন, পুরো আটটা ও নয়, চা বা কফির সঙ্গে শুনেব গল্পটা জমবে ভালো।

ইন্দ্রাণী তাকালেন। সুমিত্রাদেবী হাতে হাত রেখে বললেন, হ্যাঁ, ইন্দ্রানী, ওটার শেষ শোনার জন্য আমি অস্থির হ'য়ে অপেক্ষা করছি। বাড়ি এসে কেবলি ভাবছ তুমি কখন আসবে কখন শুনবো।' রাকেশবাবুকে ছোটো করে তোমার গল্পের প্রথম অংশটা বলে রেখেছি। সেই থেকে উনিও বসে আছেন সেই আশায়, রান্না বান্না করবো কী, চিন্তা তো ঐ একটাই।'

বিকেল থেকেই মেঘ করেছিলো, এইসময় মেঘ ডাকলো জোরে টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হ'লো, হাওয়া উঠল ঝড়ের বেগে, সুমিত্রাদেবী জানালা বন্ধ করে দিলেন।

ইন্দ্রাণী বললেন, আপনাকে আমি ব্রজবল্লভের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে পর্যন্ত বলেছিলাম, না?

'হ্যাঁ। তারপর কী হ'লো?'

এইসব খবর আমাকে অমৃতা একদিনেই যোগার ক'রে দিয়েছিলো। সেই সঙ্গে তিলক চ্যাটার্জির খবরটাও নিলাম। বড়োলোকের ছেলে, শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, কিছুকাল বাদে চেষ্টা চরিত্র ক'রে গ্লাসগোতে চলে যায়। সেখান থেকে পাশ ক'রে চাকরী নিয়ে জার্মানীতে আসে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়েও করেছিলেন, কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই ডির্ভোস হ'য়ে যায়। শেষে আর মন টিকছিলোনা

বিদেশে। তার উপর খবর গেলো তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। অমনি কাজ ছেড়ে চলে এলেন দেশে। এসে কিছুদিন বসে থাকেন, তারপর কাজ পান কলকাতায়। তারপরে ঘুরতে ঘুরতে এইখানে। বর্ধমানে আসতেই শচীনমিত্রর সঙ্গে খুব বন্ধুতা হ'য়েছিলো তিলক চ্যাটার্জির। শচীনমিত্র তাকে স্বলতার কথা সব বলেছিলেন তিলক চ্যাটার্জিই তখন জানান যে এই স্কুলে একটা কাজ খালি আছে। তার বাবা নানাভাবে এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত। যদি স্বলতা মিত্র চা'ন তা হ'লে তিনি বাবাকে বলে এটা ক'রে দিতে পারেন।

স্বলতার কাছে বলা মাত্রই তিনি হাতে স্বর্গ পেলেন। যোগ্যতাও ছেলো, সহজেই কাজটা হ'য়ে গেল। এসব খবর নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, পুলিশ ইতিমধ্যে আরো দু'জনকে সন্দেহ করেছে। একজন সুহৃদ বটব্যালের সেই আত্মীয়' অন্যজন শচীনমিত্রর বাড়ির কাজের মেয়েটি। শহর একেবারে থম থম করছে। কাছাকাছি মাত্রই তো তিনটে বাঙালী বাড়ি, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরাই কেমন সন্ত্রস্ত সর্তক। ইন্‌স্‌পেকটর পাঞ্জা প্রায়ই এর ওর বাড়ি গিয়ে হানা দিচ্ছে। শচীনমিত্রকে চোখে চোখে রেখেছে তিলক চ্যাটার্জিকে চাকরিতে যোগ দেবার জন্য শহর ছাড়ার অনুমতি দিলেও জামিন আছে। ধীলন সর্দারকে জামিনের অভাবে আটকে রাখা হ'য়েছে। রামও তার বাড়িতে অন্তরীন।

এরমধ্যেই একদিন আমি একান্তে শচীনমিত্রর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। বাড়িটায় ঢুকতে আমার গা ছম ছম করেছিলো। ঘর দুয়ার তেমনি বিশৃঙ্খল। বিশেষ করে ওদের শোবার ঘরটা—যে ঘরটাতে খুন হ'য়েছেন তাঁর স্ত্রী, সে ঘরটা হুবহু তেমনি পড়ে আছে। ঘরটা বোধহয় ঝাঁট দেয়াও নিষিদ্ধ ছিলো।

ভেজানো দরজা ঠেলে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, তারপর ঢুকে গেলাম। খাটের আড়ালে একটা কাচের চুড়ির ছোট্টো ভাঙা টুকরো পড়েছিলো, তুলে নিয়ে মনে মনে ভাবলাম সত্যিকারের গোয়েন্দারা যখন কোনো কিছুই অবহেলার যোগ্য ভাবেন না এবং বিন্দুতে সিন্ধু প্রমাণ করেন, সেই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে এটাও বোধহয় আমার রেখে দেয়া উচিত। আমি দশদিনের জমানো ধূলোবালির মধ্যে তীক্ষ্ণ চোখে দেখে দেখে আরো কিছু আবিষ্কার করতে চাইলাম। তারপর সেই সর্বনাশা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ কষ্ট হ'লো। এই জায়গাটাতেই উপুর হ'য়ে পড়েছিলেন সুলতা মিত্র। উঁচু কর্কশ সিমেন্টের চৌকাঠে চাপা ছিলো তার বুকটা, মুখটা থুবড়ে ছিলো। ও পিঠের সিমেন্টে। আমার কি নিয়তি মনে হ'লো এই নিয়তি তাঁকে সেই ঢাকা ছাড়ার পর থেকেই কীভাবে তাড়া করেছে। মৃত্যুতে পর্যন্ত ছাড়লো না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, একরাশ দাড়ি গোঁফের জঙ্গল নিয়ে শচীনবাবু তেমনি অন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বাইরে। আমার উপস্থিতি অনুভব করে মুখ ফেরালেন। বললেন, 'আসুন।' আসন দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

আমি বললাম, 'আপনার শরীর ভালো আছে?'

আবছা হেসে বললেন, 'এ অবস্থায় যতোটা সম্ভব।'

'আপনাকে বোধহয় এখানকার গোয়েন্দা দপ্তর সন্দেহ করছে।'

'জানি।'

'সেই সন্দেহ নিশ্চয়ই অমূলক।'

'যে কোনো শাস্তির জন্যই আমি প্রস্তুত।'

'যদি অপরাধটা আপনার না হয় তবে শাস্তি নিতে আপনি প্রস্তুত কেন? তার মানে কি এইটেই দাঁড়াচ্ছে না যে এই ভয়ানক কাজটা আপনার দ্বারাই সংঘটিত হ'য়েছিলো?

'আমি তো কোনোদিন কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না সুতরাং

প্রতিবাদ করেও কোনো লাভ হবে না। আমি আমাকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি।'

'ঈশ্বরের তো কোনো অবয়ব নেই, আমাদের মনপ্রাণ বিবেক-বুদ্ধি এগুলোই হচ্ছে তার অস্তিত্বের চিহ্ন। খুন যদি আপনি না ক'রে থাকেন, সেটা ও আপনার জোর দিয়ে বলা উচিত, খুনীকে খুঁজে বার করবার চেষ্টায়ও সাহায্য করা উচিত।'

'যদি কারোকে সন্দেহ করতাম, কোনো ছায়াও পড়তো মনে তবু না হয় একটা কথা ছিলো। কিন্তু সুলতার মতো এরকম একজন আশ্চর্য চরিত্রের সৎ সহিষ্ণু মেয়েকে কেউ খুন করতে পারে এ আমি কল্পনা করতে পারি না। আমার কোনো পরিচিত মুখকেই আমি তাই কোনো অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি না।'

'তিলক চ্যাটার্জি বিষয়ে—'

'না না ছি—' মাথা ঝেকে প্রতিবাদ করলেন, 'তিলক আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তিলক সুলতাকে অত্যন্ত ভালোবাসতো। 'সে কারণে আপনার মনে কি কোনোদিন কোনো ক্ষোভ বা সন্দেহ দানা বাঁধেনি?'

'নেভার।'

'শচীনবাবু—'

'বলুন—'

'প্রথমেই আপনাকে আমি একটা কথা বলে নিই। আমি কিন্তু এমনি এমনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।'

'সে-ও আমি জানি।'

'কী ক'রে জানেন।'

'আপনাকে দেখা মাত্রই আমার তা মনে হয়েছে।' একটু হাসলেন, 'তবু বলি, যে কারণেই আসুক না কেন, 'এসেছেন যে সেটাই আমার ভাগ্য। মেয়েরা সব সময় মঙ্গল নিয়ে আসেন, আমি মেয়েদের একান্ত মনে শ্রদ্ধা করি।'

'অনেক ধন্যবাদ। আপনার শ্রদ্ধেয় মহিলাদের পর্যায়ে আমি পড়ি কিনা জানিনা তবে আপনার মঙ্গল চাই সে কথাটা সত্য।'

'আমার মঙ্গল ! !'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো, জবাব দেবেন ?'

'নিশ্চয়ই।'

'ব'লে নেয়া ভালো, যদিও প্রশ্ন করার কোনো এক্তিয়ার আমার নেই, আমি গোয়েন্দা দপ্তর থেকেও আসিনি। আমি আমার নিজের ইণ্টারেস্টেই এ কাজে হাত দিয়েছি। প্রতিজ্ঞা করেছি আসল খুনীকে আমি খুঁজে বার করবোই।'

'শচীনমিত্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, চুপ করে থেকে বললেন, দেখুন টাকা আমি এর আগেও অনেকবার এরকম ঘরে এনে রেখেছি। আমার স্ত্রী বারন করতেন। কিন্তু কোনো কোনো সময় উপায় থাকতো না। বিস্তর তাগাদা দিয়ে পাওনা টাকা আদায় করতে হয়। যে আদায় করে সে হয়তো সন্ধ্যা বেলা এনে দিল। তখন তো কিছু করার থাকে না। আনতেই হয় বাড়িতে। পরের দিন ব্যাংক না খোলা পর্যন্ত রাখতেই হয়। এবার অবশ্য পেমেণ্ট ছিলো পরের দিন। সেদিন বাড়ি এলাম রাত প্রায় দশটায়, পরের দিন খুব সকালে বেরুতে হ'লো। টাকা তো তখনো ঘরে আছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না সকাল বেলায় কে আসবে, কে নেবে। আর ওঁকেই বা এভাবে খুন ক'রে যাবে কেন ?'

'সেই সময়ে আপনাদের কাজের মেয়েটি কোথায় ছিলো ?

'বাজারে।'

'সে তিলক চ্যাটার্জিকে দেখে গিয়েছিলো ?'

'বোধহয়।'

'ও কী বলছে ? ও কখন ফিরলো ?'

'ও বলছে, বাজার থেকে ও কাছেই মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিলো একবার। সাধারণত কাজে বেরুবার আগে আমিই বাজার ক'রে

দিয়ে যাই। অনেক সময় সুলতা ও আমার সঙ্গে যায়। কিন্তু সেদিন তাড়া ছিলো, চলে গিয়েছিলাম। বলে গিয়েছিলাম, 'তুমি বাঈকে দিয়েই বাজারটা করিয়ে নিও। সুলতা বলেছিলো, 'সেজন্য তুমি ভেবো না। তবে বাঈকে তো জানো, বাজারে পাঠালে একছুট্ সে তার মেয়ের বাড়ি যাবেই যাবে। যা দেরি করে ফিরতো।' এটা বাঈয়ের একটা বদভ্যাস। যতো তাড়াই থাকুক সে যাবেই যাবে।'

'সে এসে কী দেখলো?'

'আমি এসে যা দেখেছি সে-ও তাই দেখেছে। ভয়ে আর এক মুহূর্তে দাঁড়ায়নি সোজা পালিয়ে নিজের ঘরে চলে গেছে।'

'তাকে আপনার সন্দেহ হয় না?'

'না। টাকার কথা তো সে জানতো না।'

'জগমোহনবাবুর মেয়ে মুকুল বলছিলো আপনার স্ত্রী আপনার দেরি দেখে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রাত সাড়ে নটায় বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার বাঈ যখন চলে যায় তখন তিনি নাকি তাকে বলেছিলেন তোমার বাবু আজ টাকা নিয়ে ফিরবেন অথচ এতো দেরি করেছেন—

'বাঈ খুব বিশ্বাসী। মহারাষ্ট্রের লোক, কোনো লোভটোভ কোনোদিন দেখিনি। ইন্সপেক্টর পাণ্ডা ওর বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসা ক'রে গেছেন। ওকে নিয়ে গিয়ে ভয় টয়ও দেখিয়েছেন, তবে আমার নিজের ধারনা ও এটা করেনি।

'নিজে করেনি হয়তো, কিন্তু ধীলনকে গিয়ে, খবর দিয়েছে, ভাগ নিয়েছে।'

'ইন্দ্রাণী দেবী আমি বড়ো ক্লান্ত, বাঈয়ের বিষয়ে আপনারা যা করতে চান করুন, তবে আমার সন্দেহ হয়না সেটাই আমার কথা। ধীলনের সঙ্গে ওর কখনো কোনো যোগ আছে বলে আমি জানিনা।

'আপনার ধীলনকে সন্দেহ হয়?'

'না।'

'কেন'?

'এ বিষয়ে আপনি যদি তিলকের সঙ্গে কথা বলেন তবে আপনার ও সন্দেহ হবে না।'

'তিলক বাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?'

'হয়েছিলো যে দু'দিন সে শহর ছাড়বার অনুমতি পায়নি।'

'আচ্ছা আপনার নিজের বিষয়েই কয়েকটা প্রশ্ন করি।

অনুগ্রহ ক'রে ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।

হাসলেন, নিশ্চয়ই দেব।'

'সুলতা দেবীকে কি আপনি বিবাহ করেছিলেন?' তাকিয়ে থাকলেন, বললেন, হ্যাঁ।'

'কী মতে?'

'আপনার জিজ্ঞাসার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে আপনি অনেক কথা জানেন। কতদূর অব্দি জানেন বলুন, আমি তারপর থেকে আপনাকে অকপটে সব বলে যাবো!'

'তিনি কিভাবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং কীভাবে প্রতারিত হয়ে ব্রজবল্লভের স্ত্রী হতে বাধ্য হয়েছিলেন সে পর্যন্ত জানি।'

'তারপর আমি যা বলবো তা কি আপনি বিশ্বাস করবেন?'

'অক্ষরে অক্ষরে।'

'কেন?'

'আপনি তো বলেছেন মেয়েরা মঙ্গল নিয়ে আসে, সেই মঙ্গলের জন্যই আমি আজ এখানে এসেছি। আপনার প্রতি আমার কোনো অবিশ্বাস নেই।

আপনার এ কথায় আমার চোখে জল আসতে চাইছে। আমার চোখে জল আসছে না কিছুতেই অথচ আমি একটু কাঁদতে চাই।

শচীনবাবু, আপনি শান্ত হ'য়ে সব বলুন।'

আমি বর্ধমানে প্রতিদিন যেতাম না, আমার ক্লাস ছিলো সপ্তাহে তিন দিন। একদিন কলেজে এসেই দেখলাম ডাকে একটা চিঠি এসেছে। সুলতার চিঠি। একটা ছেঁড়া খোঁড়া কাগজে লেখা অমুক

দিন অমুক সময় অমুক জায়গায় আপনি এসে অবশ্য আমার জন্য অপেক্ষা করবেন জরুরী দরকার।'

'আপনি গেলেন ?'

'হাঁ।'

'উনি এলেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন ?'

'বললেন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলাম, পারিনি। ভাগ্যের অনেক দয়া এই চিঠিটা আপনাকে পাঠাতে পেরেছি।'

'তারপর ?'

'তারপর যা বললেন তা হচ্ছে এই, নিরুপায় হ'য়ে তাকে ব্রজবল্লভের স্বামীত্ব মেনে নিতে হ'য়েছিলো। মনকে এইভাবে প্রবোধ দিয়েছিলো, তবু তো লোকটা তাকে বিয়ে করেছে, না করেও তো লোভ চরিতার্থ করতে পারতো তখন ? তখন কি গতি হতো তার ? তাই কান্না থামিয়ে শান্ত হয়ে বললো, বিয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠান যা যা করণীয় করতে পার ব্রজবল্লভ তার কোনো আপত্তি নাই। ব্রজবল্লভ খুব খুশি হয়েছিলো। সোনার গহনার ভারে তাকে নুইয়ে দিয়েছিলো। প্রচুর ঘটাপাটা করে বৌভাত করছিলো। চেনা আধ চেনা কাউকে বাকী রাখেনি।'

আপনাকে নিমন্ত্রণ করেনি ?

'করেছিলেন বৈকি।'

'গিয়েছিলেন ?'

'না।'

'কেন ?'

'এই ধরণের একটা লোককে সুলতা বিয়ে করেছে সেটা আমার পছন্দ হয়নি।'

'তারপর ?'

তারপর কয়েকদিন ব্রজবল্লভ স্ত্রীকে ছেড়ে নড়লোনা বাড়ি থেকে দিনে রাত্রে তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেলো। বললো বৌ মরার পরে তোমাকে নিয়ে কম মেয়েমানুষ তো ঘাঁটলাম না, কিন্তু এমনটি আর পাইনি। তুমি হলে বিয়ে করা বৌ তার স্বাদই আলাদা। এই দ্বীপের আমিই রাজা। আর ওগুলো? বাজারের মেয়েমানুষগুলো? ছ্যা ছ্যা ভাবতেও ঘেন্না করে এখন। বলাই বাহুল্য ব্রজবল্লভের এই ধরণের ভাষা শুনে সুলতার দম আটকে আসতো। চোখ বিস্ফোরিত করে সে বোবার মতো তাকিয়ে থাকতো শুধু। ভাবতো এই লোকটা কে? কোন জগতে এর বসবাস? যখন মনে পড়ে লোকটা তারই স্বামী, তারই ইহকাল পরকালের দেবতা তখন আগুনে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করে, জলে ডুবতে ইচ্ছে করে।

'উনি নিজে এসব কথা বলেছেন আপনাকে?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'এ ভাবেই কাটছিলো দিন। সারা দিনরাত গৃহবন্দী হ'য়ে থাকা আর একটা জন্তুর সঙ্গে বসবাস করা।'

'স্কুলে আসতেন না?'

'না। সেটা ব্রজবল্লভ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলো। স্ত্রীকে সে এক পা বাড়ির বাইরে বেরুতে দিত না। স্ত্রী বিষয়ে সে পর্দা প্রথার পক্ষপাতী। আগের পক্ষের স্ত্রীর কোনো সন্তান ছিলো না। বলতো ওটা আবার একটা বৌ ছিলো নাকি? একটা পেঁচোয় পাওয়া মেয়েমানুষ। তিন তিনবার পোয়াতি হয়েছে, তিন তিনবার নষ্ট হয়েছে। শেষেরটাতো পেটের মধ্যে পচে গিয়েছিলো ভুগে ভুগে ঐতেই মরলো তা-ও কি সহজে মরে নাকি? পুরো একটা বছর জ্বালালো। তার পরেই ব্রজবল্লভের আবদার, সুলতা হ'লো তার পাটরাণী তার কাছে সে দশটা সন্তান চায়। নইলে এতো বিত্ত খাবে কে?

'কী জঘন্য!'

তার অব্যবহিত পরেই একটা অঘটন ঘটলো। নতুন বৌ নিয়ে মজে থাকার একটা বড়োরকমের খেসারত দিতে হ'লো। মস্ত একটা অর্ডার অমনোযোগের সুযোগে বেরিয়ে গেলো হাত ফসকে। ক্ষতি হলো অনেক। ব্যবসায় ভাঁটা পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হ'লো সুলতাই অপয়া। নইলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই এমন অলক্ষ্মী লাগবে কেন? লোকে বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। এ তো তার উল্টো। তখন থেকেই শাস্তি শুরু হয়েছিল, আরো পরে যখন জানতে পারলো আমি সুলতার ভাই নই, কোনো আত্মীয়ও নই নিতান্তই পথের পরিচিত বন্ধুমাত্র তখন সে যা আরম্ভ করলো তার কোনো তুলনা নেই। মারধোর আটকে রাখা না খেতে দেয়া কিছু বাকী রাখলেন না।'

'আহারে!'

সেবকম সময়েই সুলতা আত্মহত্যার চেষ্টা ক'রে বিকল হ'য়ে আমকে চিঠি লেখে।'

ও।'

সব শুনে আমি বললাম, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

সুলতা বললো 'কোথায়?'

আমি বললাম, 'এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে।'

সুলতা আবার বললো, 'কোথায়?'

আমি বললাম 'আমার সঙ্গে।'

'আপনার সঙ্গে।

'আমি আপনাকে এখান থেকে দূরে, অনেক দূরে নিয়ে যাবো। সেখানে কেউ আমাদের ছুঁতে পারবেনা। আমি আজ নিঃসংকোচে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, প্রথম দিন থেকেই আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসি বলেই সবসময় নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। আমার মনে হ'তো আমার হৃদয়ের কোনো কথার একবিন্দু আভাস পেলেও আপনি নিশ্চয়ই ভাববেন এজন্যই আপনাকে

আমি সাহয্য করেছি। এবং আর সকলের মতো আমিও একজন লোভি পুরুষ মাত্র।

স্মলতা ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলো। বললো কী যে লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি কল্পনা করতে পারবেন না। ফির গিয়ে কোন আগুনের মুখে পড়বো জানিনা। আজ আমিও নিঃস কোচে স্বীকার করছি আমার সমস্ত স্বপ্ন আপনাকে ঘিরে ঘিরেই প্রবাহিত হতো।

আমি বললাম তা হলে চলো।

স্মলতা বললো, এখন? আমি বললাম 'এই মুহূর্তেই।'

'কিন্তু আপনি?

'আমার জন্য ভেবোনা, পিছন ফিরে তাকিয়োনা আর আমি তোমাকে ফিরতে দেবোনা ঐ নরকে। ঈশ্বর সাক্ষী থাকুন, আজ থেকে তুমিই আমার ধর্মপত্নী। আমি কোনদিন তোমার কোনো কষ্টের কারণ হবোনা। তোমার আগে আর আমি কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালোবাসিনি, তোমার পরেও যেন আর কেউ আমার হৃদয়কে কলুষিত না করে।

একটা ট্যাকসি যাচ্ছিলো হাত দেখিয়ে থামালাম, স্মলতাকে হাতে ধ'রে তুলে দিয়ে নিজেও উঠে বসলাম।

'কোথায় গেলেন?'

'সেইসব বিস্তৃত ইতিহাস আপনার কোনো কাজে লাগবেনা। শুধু জেনে রাখুন সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলোনা। হাজার হোক ব্রজবল্লভের মতো একটা বিত্তশালী লোকের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া—বিশেষত যার চরিত্র কোনো সভ্যতার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, তার প্রতিহিংসাবৃত্তি কতোটা উগ্র হ'তে পারে আমার অজানা ছিলো না। তবে জগৎ পিতা তাঁর সংসারে সর্বদাই একটা ভারসাম্য বজায় রাখেন সেজন্য বন্ধু পেয়েছিলাম সাহায্যকারী। সেই বন্ধুতার ফলেই আজ এখানে এসে শান্তিতে কাটাতে পারছিলাম কয়েকটা বছর।

বিয়ে করেছিলুম বৈষ্ণব মতে নবদ্বীপে গিয়ে। সবই তো মানুষের মনকে চোখ ঠার দেওয়া ? আমার কোনো দরকার ছিলোনা বিবাহের আমার ভালোবাসাই আমার সবচেয়ে মূল্যবান দলিল ছিলো। সুলতা চাইলো।

১৬

এরপরে আমি বাড়ির শুধু ঘরই নয়, আশেপাশেও ঘুরে ফিরে দেখলাম। সামনে পিছনে সর্বত্র। যেখানটায় টাকার বাণ্ডিলটা রেখেছিলেন সে জায়গাটও আবার দাঁড়ালাম চুপ ক'রে। পায়ের তলায় তোষকের একটা কোন। বললাম 'শিয়রে না রেখে পায়ের তলায় কেন ?'

শচীনবাবু বললেন, 'সুলতা আমার দেরি দেখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। গেট থেকে বাগান পেরিয়ে বারান্দা থেকে এই দরজা দিয়েই ঢুকেছিলাম, বিছানার এইখানটাতেই বসে কথা বলতে বলতে টাকাটা ওকে দেখিয়ে গুণে তোষক তুলে রেখে দিলাম। শিয়রে রাখি বা পায়ের তলায় রাখি, একই তো কথা। কিন্তু চুরিটাতো রাত্তিরে হয়নি, হয়েছে সকালে, আমি বেরিয়ে যাবার পরে। আসলে সবই আমার ভাগ্য ইন্দ্রাণীদেবী। আমি বিদায় নিতে নিতে বললাম, আচ্ছা, আপনি যে সন্ধ্যাবেলা তিলক চ্যাটার্জি আর ধীলনকে দেখেছিলেন সে কথা কী সুলতা দেবীকে বলেছিলেন ?

'হ্যাঁ', বলেছিলাম।'

'শুনে উনি কী বললেন ?'

'বললেন, ধীলনের সঙ্গে দেখেছ ? আশ্চর্য তো ! ধীলনকে তো উনি পারলে ফাঁসি দেন।' যাকগে এখানে যখন এসেছেন, আমাদের সঙ্গে ও নিশ্চয়ই দেখা করবেন, তখনই জানতে পারবেন সব।'

'তারপর আর কোনো কথা হ'লো না ?'

'না।'

দাঁড়ালাম গেটের কাছে, ইতস্তত করে বললাম, 'তিলকবাবুর বিষয়ে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আপনার মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিলোনা না?

চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি জানতাম তিলক সুলতার প্রতি ধীরে ধীরে একটু বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়েছে।'

'কী করে জানলেন? তিনি বলেছিলেন?'

'তিলকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব সহজ ছিলো। একদিন সে নিজেই আমাকে বললো, দেখ শচীন, মানুষ অনেক তপস্যা করলেই সুলতার মতো একজন স্ত্রী পায়। অনেক তপস্যা করলেই তোমার মতো একজন স্বামী পায়। একথা শুনে হেসে বললাম, 'তাই নাকি'?

পূণ্যবানদের কী প্রাপ্তি তাতো জানলাম, পাপিষ্ঠ বন্ধুটি কী পাপে পাপী হ'লো তাতো বললে না। তিলক বললো, তোমার সুন্দর সংসার আর সুন্দর বৌ সম্ভবত আমার অবচেতন মনে হিংসার কারণ হয়েছে। স্বীকার না করে পারছি না, বন্ধুপত্নীটির প্রতি আমি বেশ দুর্বল। একথা শুনে আমি তেমনই হেসে বললাম, বন্ধু এবং স্ত্রী দু'জনের বিষয়েই আমি গর্ব বোধ করছি। তিলক বললো, কেন? কেন? আমি বললাম বন্ধু বিষয়ে গর্ববোধ করছি তার রুচিবোধ দেখে এবং স্ত্রী বিষয়ে গর্ববোধ করছি এই রকম একজন আকর্ষণীয় মহিলা আমার স্ত্রী বলে।

'এরপরে আপনাদের আর কোনো কথা বার্তা হলো না?'

'হলো। আরো অনেক কথার পরে আমি তাকে পুনরায় বিবাহ করার পরামর্শ দিলাম। চাকুরিসূত্রে একটি মেয়ের সঙ্গে তার সামান্য ঘনিষ্ঠতা ছিলো, তারপর কে কোথায় ছিটকে গেছে। মেয়েটি কিন্তু চিঠিপত্র লিখতো। আমি তাকেই বিবাহ করতে বললাম। গুণের অভাব ছিলোনা সেই মেয়ের। ভালো চাকরি করে দেখতে সুন্দর—দেখা হয়েছিলো বিদেশেই—'

'কী বললেন তিনি ?'

'হাসলো।'

'এর কদ্দিন বাদে উনি অন্যত্র গেলেন ?

'মাস দু'য়ের মধ্যে।'

'চিঠিপত্র লিখতেন ?'

সুলতাকে বোধহয় দু'টো একটা লিখেছিলো।'

'আপনি পড়েননি ?'

'খেয়াল হয়নি। চিঠি তো টেবিলেই পড়ে থাকতো।'

'আপনার স্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন ?

'আমি ঠিক জানি না।'

আপনাকে না লিখে আপনার স্ত্রীকে লিখেছেন বলে আপনার মনে কোন ক্ষোভ হ'লো না ?'

শচীনবাবু হেসে বললেন, আমি কি ছেলেমানুষ নাকি ? আর তিলক ঠিক জানতো আমাকে লিখলে জবাব পাওয়া কঠিন, সুলতা তক্ষুণি জবাব দেবে। যদ্দুর ধারণা কোনো কাজের কথাই লিখেছিলো যার জবাব পাওয়া অতি জরুরী।

স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস। কী অম্লান হৃদয়। বন্ধুকে কতো ভালোবাসতেন। ভদ্রলোকটির প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা হ'লো।'

বেলা বেড়ে উঠেছিলো, বাড়ি ফিরে এলাম। সন্দীপ সকালে কোথায় কাজে গেছে বলে গেছে, ফিরতে বেলা শেষ। মেয়ে স্কুলে। হাওয়া বেশ তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। বসার ঘরে ঢুকেই ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে বসলাম। ভীষণ গরম লাগছিলো। পদ্মাবতী বললো, 'গোসল করবে না ? বললাম, 'আগে ঠাণ্ডা হই তো। সে ফিরে গেলো। আর তখুনি বেল বাজিয়ে তিলক চ্যাটার্জি ঘরে ঢুকলেন।

আমি দরজা খুলে দিয়ে অবাক হ'য়ে বললাম 'আপনি !'

তিনি বললেন, 'অসময়ে এলাম, ক্ষমা করবেন।'

'কিন্তু আমার স্বামীতো এখন বাড়ী নেই।'

'জানি। আমি আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে ?'

'শুনলাম সুলতা দেবীর কেসটা আপনিই হাতে নিয়েছেন।'

আমি বললাম বসুন। দাঁড়িয়ে কেন ? বসলে বললুম, কেসটা হাতে নিয়েছি বললে আমাকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়, বলতে পারেন বামুন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার সখ হয়েছে। কিন্তু আপনি জামিন দিয়ে কাজে জয়েন করতে চলে গিয়েছিলেন।

'কিছুক্ষণ আগে এসেছি।'

'কোনো বিশেষ কাজে ?'

'হ্যাঁ।'

'এই খুন সংক্রান্ত ব্যাপারে '

আমি বলতে চাইছি হঠাৎ পুলিশ কোনো প্রমান না পেয়েই ধীলনকে আটকে রেখেছে কেন '

এ কথায় আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে বললাম, সেটা কি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, কেন ? যারা আটকে রেখেছে সেখানে গিয়ে বলুন।'

'কাজ হবে না।'

'আমি বললে হবে ?'

তিলক চ্যাটার্জি একটু হাসলেন। চুপ করে থেকে বললেন 'হবে।'

আমি তেমনই গম্ভীর থেকে বললাম, 'আমি কি ওদের কর্তা ?'

'ওদের যিনি কর্তা আপনি তাকে বলুন এ রকম অকারণে একটা লোককে আটকে রাখা খুব অন্যায় হচ্ছে। কই আমাদের তো কাউকে রাখেন নি।

'আপনারা কি ওর মতো চোর ডাকাত ?'

তা না হতে পারি, কিন্তু কে খুনী বা কে চোর তা নিয়েই তো আমাদেরও কম তোলপাড় করা হচ্ছে না ? আমার অনুরোধ,

আপনার স্বামী ফিরে এলে আপনি তাকে বলুন উনি যেন ওকে ছেড়ে দেবার হুকুমটা দিয়ে দেন।'

আমি ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতেই বললাম, আপনার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত লোক যে এ ধরণের কোনো অনুরোধ এভাবে আমাকে জানাতে আসতে পারে সেটা আমার কল্পনায় আসেনি।'

তিলক চ্যাটার্জি যুক্তকর হয়ে বললেন, 'আপনার স্বামীর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলাম। শচীনের কাছে শুনলাম তিনি শহরে নেই এবং একথাও বললো, কেসটা আপনিই হাতে নিয়েছেন। আপনার কাছে এলে আপনি হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।'

আপনি শচীন বাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'হ্যাঁ।' আপনিও বেরিয়ে এলেন আমিও ঢুকলাম।

'আপনি কি এখানে অফিসের কাজে এসেছেন?'

'না। ধীলনের জন্য।'

'ধীলনের জন্য? ধীলনের জন্য আপনি কেন?

'যদি বিশ্বাস করেন তাহলে বলি, আমি চেষ্টা করছি ও যাতে ওর এই নোংরা জীবন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়।

'সমাজ সংস্কার?'

'নাম যা খুশি দিননা, কী এসে যায়?'

'হঠাৎ ধীলনের জন্য এই ধরনের মহৎ করুণা আপনি কবে থেকে অনুভব করলেন।'

তিলক তাকিয়ে থাকলেন, সামন্য হেসে বললেন, 'প্রশ্নটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে। তবুও আমি এর জবাবে বলবো, এই অনুভূতির কারণ একজন মানুষের প্রভাব।

'কে সে?'

'সুলতা মিত্র।'

নড়েচড়ে বসলাম, উৎসুক ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম?'

'একটা এমন মামলা ঝুলছে ধীলনেব মাথাব উপব যাব সাক্ষী আমি হ'লে সে যাবজ্জীবন কাবাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

'কিসের মামলা ?

'ডাকতি এবং পিটিয়ে মাবা।'

'তা অন্যায করলে তো তাব শাস্তি পেতেই হবে।

'সত্য কথা। কিন্তু অন্য সত্যও আছে মানুষেব জীবনে।'

যথা ?

'কোনো একদিন কথা প্রসঙ্গে আমি সুলতাদেবীকে বলেছিলাম এই ধবণের পাষণ্ড লোককে একটা একটা ক'রে ফাঁসি কাঠে ঝোলানো যায় তবেই এদের শিক্ষা হয়।

সুলতা দেবী হেসে বলেছিলেন, 'ফাঁসিকাঠে উঠলে তো আব ফিরে আসবেনা, শিক্ষাটা হবে কখন ?'

আমি বলেছিলাম, 'ও আর আসবেনা কিন্তু উদাহবণ দেখে অন্যদের তো শিক্ষা হবে।'

উনি বললেন, 'হচ্ছে কি ? ফাঁসিকাটে তো এদের মতো লোকেবা অনববতই ঝুলছে। অমনি দেখা যাচ্ছে আব একজন উপস্থিত। জানেন তো আমি গান্ধিভক্ত, আমি বিশ্বাস করি হিংসা দিয়ে হিংসাব উচ্ছেদ হয়না, তার জন্য দয়া দরকার মায়া দবকাব তাদের মন কী ভাবে কাজ কবছে সেটা জানা দবকার। আমি রেগে গিয়ে বলেছিলাম, তা হলে কি আপনি চান যে ধীলনেব মতো লোকদের এভাবে ছেড়ে বাখা উচিত ? সুলতাদেবী বললেন, আমি তো সকলের কথা জানিনা তবে ধীলনেব বিষয়ে জানি যে এই ধবণেব লুকিয়ে পালিয়ে ঘৃণা কুড়োনো জীবন আব সহ্য করতে পারছেনা।'

'আপনাকে বলেছে নাকি ?' আমি জোবে হেসে উঠেছিলাম। উনি দুঃখিত হ'য়ে বললেন, 'রামকে চেনেন তো, সুশোভন বাবুব নাতি, ও বলেছে ধীলনের মতো দুঃখী আর কেউ নয়।'

এবারেও আমি সে ভাবেই হেসে বললাম, বাঃ রতনে রতন চেনে

রামমূর্ত্তিটি ও সেই পথেরই পথিক কিনা তাই তার গুরুর প্রতি ভক্তিটি একেবারে অচলা।' সুলতা বললেন, 'রাম একটু খারাপের দিকে গিয়েছিলো সেটা ঠিক কিন্তু ওকে ঐ ধীলনই বুঝিয়ে পটিয়ে সুবুদ্ধি দিয়ে অনেক অন্যরকম ক'রে দিয়েছে। বলেছে, 'দ্যাখো আমার জীবনে আমি কখনো কারো স্নেহ পাইনি, মা মরে গেছে অজ্ঞান বয়সে, সংসার লাথি ঝাঁটা খেতে খেতে মানুষ। তার উপর আধপেটা খাওয়া একদিন শেষে পালালাম। পালিয়ে আর কোথায়? এই তো এই নরকে। এখন আর হাজার চেষ্টা করেও এ থেকে উদ্ধার পাচ্ছিনা। মার্কা মারা হয়ে গেছিতো, কেউ ভালোবাসেনা, কেউ বিশ্বাস করেনা, সবাই ভয় পায়। সব মন্দ কাজই আমার নামে চলে যায়। একটা মামলা চলেছে, আমি কিন্তু সত্যি নির্দোষ। তবু জানি আমাকেই ঠুকে দেবে জেলে। আপনি তো জানেন তিলকবাবু রাম এখন আমার কতো অনুগত হয়েছে। আমি ওকে পড়াবো দেখবেন ঠিক ও পাশ ক'রে যাবে, মানুষ হবে।

আমি অট্টহাস্য ক'রে বললাম, ধীলনকেও এই সঙ্গে পড়ান না।

দেখুন না ও-ওহয়তো মানুষ হয়ে যাবে। 'সুলতাদেবীর মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। মমতার গলায় বললেন, 'চেষ্টা করতে দোষ কী? রাম আমাকে ধীলন বিষয়ে আরো অনেক কথা বলেছে। আমি সত্যি সত্যি ভাবছি একদিন ডেকে পাঠাবো, আমাকে দিয়ে যদি ওর কোনো উপকার হয়, যদি এই ধরণের জীবন থেকে ওকে বেরিয়ে আসতে একবিন্দু সাহায্য ও করতে পারি তাই করবো। এরপরে আর আমি কিছু বললাম না। একজনের এই রকম সরল বিশ্বাসের উপর আর আঘাত দিতে মন চইলো না। তারপর যথারীতি সেই সব কথা মনেও ছিলোনা, মনে রাখার প্রয়োজন ও হয়নি। এখান থেকে বদলি হ'য়ে যাবার কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎ দেখি একদিন ধীলন আমার বাংলোয় এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। দারোয়ান দিয়ে তখুনি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু তখুনি ডাকলাম। সুলতা

দেবীর কথাটা মনে পড়ে গেল। তারপরে শুনলাম ওর আর্জি, ওর জীবন কাহিনী, ধীরে ধীরে বিশ্বাস করলাম। ও বলতে চাইছে যে ডাকাতির কেসটা ওর নামে ঝুলছে সেটার জন্য ও দায়ী নয়। ও ছিলোই না সেইসময়ে সেইখানে। আমি যদি ওর হ'যে সাক্ষী দিই তা হ'লে হযতো ও ছাড়া পেযে যেতে পারে, নইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অবধারিত। সেই ডাকাতরা বাড়ির মালিককে পিটিযে মেরে ফেলেছিলো।' তিলক চ্যাটার্জি চুপ করলেন।

আমি ও খানিকক্ষণ চুপ ক'র থেকে বললাম 'ওর স্বপক্ষে সাক্ষী তাহ'লে আপনি দেবেন?'

'হ্যাঁ তা তো দেবই, আমি মামলাও লড়বো ভালো উকিল দিযে। মিথ্যা মামলা থেকে ওকে খালাস আমি করবোই। কিন্তু এখন আবার যদি একটা খুনের মামলায ঝুলে যায, খুব কঠিন হবে বাঁচানো।' চুপ করে থেকে বললেন, 'একটি মেযেকে ও ভালোবাসে। সেই মেযেটিও ওরই মতো সংসার লাথিঝাঁটা খাচ্ছে দিবারাত্র। ওর বাপ ধীলনকে গুণ্ডা জেনেও বিয়ে দিতে গররাজী নয, গোলমালটা হচ্ছে টাকা নিয়ে। গরজ বুঝে ও এতো টাকার জন্য চাপ দিচ্ছে যা ধীলন দিতে পারে না। আমি জানি সুলতাদেবীর মৃত্যুর আগের রাত থেকে ও এই শহরেই ছিলো না।

'কী ক'রে জানেন? ও বলেছে তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে আপনি এতোটাই বিশ্বাস করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন, আমার কিছু করণীয় নেই। এসব গোয়েন্দা দপ্তরের ব্যাপার।'

'যদি দয়া ক'রে মেয়ের মন নিয়ে আপনি আপনার স্বামীকে—'

'অসম্ভব।'

'তা হ'লে?'

'আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন ?'

'বলুন।'

'যেদিন খুন হ'লো সেই সকালে তো আপনি সেখানে গিয়েছিলেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তাঁকে আপনার কেমন মেয়ে ব'লে মনে হ'তো ?'

'আদর্শ।'

'তাঁর প্রতি আপনার প্রেম ছিলো ?'

'সে রকমভাবে কখনো ভেবে দেখিনি। তবে বুঝতে পারছিলাম আমার সরে যাওয়া উচিত।'

'সেজন্যই কি বদলী হ'লেন ?'

'অনেকটা তাই।'

'বদলী হ'য়ে কি কোনো পরিবর্তন হ'লো ?'

হাসলেন, 'আমি শীগ্‌গিরই বিয়ে করছি। সকালে সেই খবরটা দিতেই এসেছিলাম। দেখলাম শচীন তার আগেই বেরিয়ে গেছে।'

'সুলতাদেবী খুশি হ'লেন ?'

'খুব। অনেক প্ল্যান করছিলেন কী কী করবেন।'

'গুজব আছে শচীনবাবু আর সুলতাদেবী বিবাহিত নন, কথাটা কি সত্য ?'

'দেখুন বিবাহ বিষয়ে সকলের ধ্যানধারণা একরকম থাকে না। মানুষের মন কতোগুলো সংস্কারের বস্তা মাত্র। আমি যদ্দুর জানি ঠাকুর পুরুত ডেকে কিছু না করলেও বা কতোগুলো লোককে পাত পেতে না খাওয়ালেও এক ধরণের বিয়ে ওঁরা করেছিলেন। সেটা ঠিক কীভাবে হ'য়েছিলো আমি জানি না। তবে কেউ যদি আমাকে কোনো দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে বলে আমি বলবো তাদের জীবন যেন শচীন সুলতার মতো হয়। যাকগে সে সব, ধীমান বিষয়ে আমার আবেদনটা যদি আপনি একটু মনে রাখেন সত্যি কৃতজ্ঞ

হবো। ওর জন্যে আমি যে কোনো জামিন রাখতে প্রস্তুত আছি।'

হেসে বললাম, কিছু দরকার নেই, কালকে আমি আসল খুনীকে সনাক্ত করতে পারবো বলে আশা করছি।'

মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে প্রায় বিদায় না নিয়েই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি শোবার ঘরে এসে আপন মনেই হাসলাম একটু তারপর স্নানে চলে গেলাম।

১৭

সন্দীপ ফিরে এসে বললো, 'তোমার কাজ কদ্দুর এগুলো?'

বললাম, 'ষোলো আনা।'

'ব্রাভো। বলো শুনি।'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'বলো।'

'যে রুমালটা দিয়ে মহিলার গলা বাঁধা ছিলো সেটা আছে তো?'

'আছে। তবে সেটা ঠিক রুমাল নয়, একটা রুমাল আকৃতির পুরোণো সিলকের টুকরো।'

'ওটা আমাকে একটু দেখাতে পারো?'

'নিশ্চয়ই। তবে এই মুহূর্তে আর কী ক'রে হবে?'

'আচ্ছা, তোমরা তো হাতের ছাপ দেখে অনেক কিছুই বলে দিতে পার। ব্যাপারটা তো নিশ্চয়ই বিজ্ঞান সম্মত?'

'নিশ্চয়ই।' উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'লো সন্দীপ, 'জান তো হাতের আঙুলের ছাপ সনাক্তকরণ করে এবং কোথায় হয়?

'না।'

'সাতশো শতাব্দীতে। এথেন্সে। কী আশ্চর্য, না? তবে তখন তো ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় হ'তো না, কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা থেকে যতোটুকু বোঝা যায়। অনেক পরে, আঠারো শতকেরও পরে

উইলিয়ম হারসেলের সূত্র ধরে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের এক পুলিশ অফিসার হেনরি গেলটান এর উপরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। তারপরে ১৮৯২ সালে 'ফিঙারপ্রিন্ট' নামে একখানা বই বেরোয় তাঁর। সেটাই হাতের ছাপের প্রামাণ্য পুস্তক। ঐ বই-ই এর উপরে গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

'কী আশ্চর্য, না?'

'ভীষণ। ভীষণ। সত্যি বলতে অপরাধী চিহ্নিত করতে এই অদ্ভুত প্রথাই আমাকে প্রথম এই কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। আঙুলের ছাপ সংগ্রহের কাজটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমি তোমাকে কাল বই পড়ে সব বুঝিয়ে দেব। এখন বলো তুমি কাকে সন্দেহ করছো।'

'রুমালের মধ্যে কি তোমরা সেই হাতের ছাপ কিছু আবিষ্কার করতে পারনি?'

'না।'

'জানো, আমি যখন প্রথম শচীনবাবুদের শোবার ঘরটাতে ঢুকলাম, আমার নাকে একটা গন্ধ এসে লাগলো। গন্ধটা চেনাও নয় অচেনাও নয়। তখন আমি তোমার সঙ্গে যাইনি, আগেই ছুটে গিয়েছিলাম প্রতিবেশীদের সঙ্গে। তারপর তোমার সঙ্গে যখন গেলাম, গন্ধটা মৃদু থেকে মৃদুতর হ'য়েছে। পিছনের উঠোনে ঘুরতে ঘুরতে সেই গন্ধের উৎসটাও আমি খুঁজে পেলাম।'

'আচ্ছা! তারপর? কিসের গন্ধ সেটা।'

'উৎসেরও তো উৎস থাকে, দু'চারদিন বাদে সেই উৎসের ও উৎসকে পেয়ে গেলাম।'

'আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না, কাকে ভাবছো শীগ্‌গির বলো।'

'শুধু গন্ধের উৎসই নয়, যে রুমাল দিয়ে অথবা পুরোণো সিল্কের কাপড়ের টুকরো দিয়ে স্নলতা দেবীকে ফাঁস লাগানো হ'য়েছিলো তার উৎসও দেখতে পেলাম।'

'মানে।'

'মানে, ঠিক ঐ কাপড়েরই আর একখানা রুমাল।'

'কার কাছে?' সন্দীপ বড়ো চোখ ক'রে তাকালো।'

'বলো তো কার কাছে? তোমার কিন্তু খেয়াল করা উচিত ছিলো।'

'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছো?'

'শচীনবাবুর কাছে: আমি কী ক'রে খেয়াল করবো? নিশ্চয়ই পকেট থেকে আমার কাছে তিনি সেই রুমাল বার করেননি।'

'রুমাল কী জন্য থাকে?'

'মুখ মোছার জন্য। শচীনবাবু এতো নির্বোধ নন যে জোড়া রুমালটি আমার কাছে বার করবেন। কিন্তু তুমি কী করে দেখলে? তোমার সামনেও তো সেটা বার করা উচিত নয়।'

'নিশ্চয়ই নয়।'

'তবে কি জানো, খুনীরা যেমন সব সময়েই খুনের জায়গায় ফিরে ফিরে আসে তেমনি যা দিয়ে খুন করেছে, তাও প্রকাশ ক'রে ফেলে মাঝে মাঝে। তাদের বিহ্বলতাই তাদের দিয়ে ঐ সব ভুল করায়। আমি গোড়া থেকেই শচীনবাবুকে সন্দেহ করেছি, তুমিই সব সময়ে ওঁর পক্ষে কথা বলেছো। তোমার দরদ সবসময়েই শচীনবাবুর উপরে। এখন?'

'আমার কথা শুনেছো কেন?'

'ঐটেই তো আমার মস্ত দোষ। তোমার বুদ্ধির উপর আমার অকারণ আস্থা। ভালোবাসার চক্ষু কাণা যে!

'থাক। আর ভালোবাসায় কাজ নেই। বুদ্ধিকে যদি বুদ্ধি বলে গণ্য না ক'রে চক্ষুকাণার দোহাই দাও তা হ'লে আমি এই চুপ করলাম। আর বলবো না।'

'না না লক্ষ্মীটি বলো। এই রুমাল ছাড়া শচীনবাবুর কাছে তুমি আর কী প্রমাণ পেয়েছো?

'রুমালটা কি কম প্রমাণ ?'

'ও হরি। এতো পরিশ্রম ক'রে তুমি এটুকুই আবিষ্কার করলে ?'

'রুমালটা একটা ছেঁড়া সিলকের শাড়ি কেটে তৈরী হ'য়েছিলো এবং সে শাড়িটা—'

'ছিলো সুলতাদেবীর এই তো ? এবং রুমালটি তিনি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন ?'

'না।'

'না হয় তিনি না-ই দিলেন, ধরা যাক দর্জিই দিয়েছে। কিন্তু রুমাল দিয়ে তাকে তুমি কী ক'রে ধরবে ? রুমালে কী প্রমাণ হবে ? আর দৈবাৎ না হয় রুমালটা তিনি তোমার কাছে অসাবধানতা বশত বার করে মুখই মুছে ফেলেছেন কখনো, তারপরে যে তাঁর খেয়াল হয়নি কী ক'রে জানো ? রুমাল যে তিনি তখন ড্রেসট্রয় ক'রে ফেলেননি তার কী প্রমাণ ?'

আমি হাসছিলাম। সন্দীপ রেগে গিয়ে বললো, 'হাসছো কী ? মিছিমিছি সময় নষ্ট।'

চুপ ক'রে থেকে বললাম. 'রুমাল আমি শচীনবাবুর কাছে দেখিনি।'

'তবে ?'

'আর কার কাছে হ'তে পারে তুমিই বলো না।

কিছুটা থমকে গিয়েছিলো সন্দীপ। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভেবে বললো, 'সুলতাদেবীর শাড়ির টুকরো দিয়ে রুমাল পাবার আর কে অধিকারী হ'তে পারে ? নিশ্চয়ই তাঁর প্রেমিকটি।'

'তিলক চ্যাটার্জি ?'

'আর কে ?'

'কিন্তু রুমাল দিয়ে তো কেউ ফাঁসি দেয়নি ? দিয়েছে তো শাড়ির টুকরো দিয়ে।'

'ঐ একই হ'লো। সকালে ঐ ব্যক্তিই তো এসেছিলো, কোথায়

খাটের উপরে পড়েছিলো টুকরোটা, নিয়ে কাজ সেরেছি।'

'আর তারপরে এসে মুখ মুছে আমাকে তার জোড়াটা দেখিয়ে গেছে, না? কী বুদ্ধি! পুরুষ মাত্রই বোকা।'

'কী!'

'হ্যাঁ। সবসময়ে বলো মেয়েদের বুদ্ধি আর কতোদূর যাবে। কিন্তু যদি যেতেই হয় মেয়েদের বুদ্ধিই অনেক গভীরে যায়। তোমাদের মতো নির্বোধদের চরাতে হয় বলে ঈশ্বর স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তাদের অনেক সমৃদ্ধ ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন ভব সংসারে।'

'খুব যে অহংকার হ'য়েছে?'

'কেন হবে না? দিনবাত পড়ুয়া দশ বছর চাকবি করা একটা লোক যা পারেনি, আমি তা তিনদিনে পেরেছি, আমার অহংকার হবে না তো কার হবে?'

'পেরেছো?'

'হ্যাঁ পেরেছি।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'ঐ রুমালই তার প্রমাণ?'

'হ্যাঁ, অনেক কিছুর মধ্যে সেটাও একটা বৈকি।'

'রুমালটার অস্তিত্ব এখনো বর্তমান বলে তোমার ধারণা।'

'অন্তত কাল পর্যন্ত ছিলো।'

'কাল কেন? আজকেও ছিলো নিশ্চয়ই।

'আজকের কথা জানিনা।'

'কেন জানবে না। তিলকবাবু তো আজই এসেছিলেন।

'এসেই বুঝি রুমালটা দিয়ে মুখ মুছতে লেগে গেলেন। আর তাছাড়া এইমাত্র তো বললাম, রুমালটা যে ছিলো কালও আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। তিলকবাবু কাল এখানে ছিলেন না, কাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। উনি আজই এসেছেন. এসেই শচীনবাবুর বাড়ি

গেছেন, সেখান থেকে আমার কাছে এসেছেন অথবা তোমার কাছে। আর কী জন্য এসেছিলেন, খেতে বসে তো বললামই তোমাকে।'

'তবে তুমি রুমাল কোথায় দেখলে? কার কাছে দেখলে? তিলকবাবুর সঙ্গে যে ধীলনের সাট আছে তাতো বোঝা যাচ্ছে, তুমি কি কাল ধীলনের সঙ্গে দেখা করেছো কোনো ভাবে?'

'করলে নিশ্চয়ই তোমার পারমিশন নিয়ে করতে হ'তো?'

'তাই তো।'

'তবে?,

'অনুমান করো।'

'বাগে পেয়ে কষ্ট দিচ্ছ, না?'

'না। একটা স্বীকৃতি আদায় ক'রে নিতে চাই।'

'কিসের স্বীকৃতি?'

'নিজের পুরুষ জাতটাকে উঁচু করবার জন্য মেয়েদের কোনোদিন ছোট করতে চেষ্টা করবে না এই স্বীকৃতি।'

'ঠিক আছে, মেনে নিলাম।'

১৮

সুমিত্রাদেবী এবং তার সাংবাদিক অতিথি গল্প শুনতে শুনতে স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। যেন একটা উপন্যাস পড়ার নেশায় বুঁদ হ'য়েছিলেন। এই সময়ে রাকেশ সমাদ্দার হেসে ফেললেন, বললেন, 'বাব্‌বা আপনি তো আচ্ছা মেয়ে, সুযোগ পেয়ে কবুল করিয়ে নিলেন ভদ্রলোককে দিয়ে?'

ইন্দ্রাণীও হেসে বললেন, সকালে সুমিত্রাদিকে বলেছি আমার স্বামী আমাকে ফেমিনিষ্ট বলে খ্যাপায়। মজাটা দেখুন আপনারা সারা-দিন মেয়েদের কাছ থেকে সেবা শুশ্রুষা বুদ্ধি পরামর্শ সাহায্য সব

নেবেন, জন্মাবেন তাদের পেটে, তাদের নির্যাস টেনে বড়ো হবেন আর তার পরেই ছেঁড়া কাঁথার মতো তাদের অবহেলায় ঠেলে দেবেন। কথায় কথায় বলবেন বারোহাত কাপড়েও মেয়েদের কাছ হয় না, মরার আগেও তাদের বুদ্ধি পাকে না। যে কোনো বড়ো কাজেই তারা অক্ষম, প্রতিবাদ করলেই ফেমিনিষ্ট। কী অন্যায় কথা।

'ক্ষমা চাইছি, গল্পটা বলুন। খুব ইণ্টারেষ্টিং।

আপনি অনুমান করুন না কিছু। সব চরিত্রগুলো তো আপনি আমার কথার ভিতর দিয়েই দেখতেই পেলেন।

সুমিত্রাদেবী লাফিয়ে উঠে বললেন, 'বুঝেছি।'

'বলুন।'

'তুমি বলো শুনি তারপর বলবো।'

ইন্দ্রাণী হাসলেন, 'বারে আমি বললে তো সব চুকেই গেল। তখন বললেই কি আর না বললেই কি। ঠিক ঠিক মানুষকে ধরতে পেরেছিলাম কিনা তাতো অন্তত জানা যাবে।'

অমৃতা বললো, ইন্দ্রাণীদির এই প্রথম খুনী ধরার গল্পটা কিন্তু আমিও জানতাম না। শুনতে শুনতে আমারও রীতিমতো রোমাঞ্চ হচ্ছে।'

রাকেশ সমাদ্দার হেসে বললেন, 'আমরা ধরতে না পারলেও আপনার কিন্তু পারা উচিত।'

'আমি কিছুই ভাবতে পারছি না।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আচ্ছা আমি আবার তোমাদের কাছে সব কটা চরিত্রের তালিকা দিচ্ছি, এর মধ্যে বেছে নাও।'

অমৃতা চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললো, 'ঠিক আছে, তুমি একে একে নামগুলো বলো। এবং মহিলাকে কীভাবে প্রথম দেখেছিলে সেটাও বলো।'

তবে শোনো, 'মহিলা শোবার ঘরের আর খাবার ঘরের মাঝ-খানের চৌকাঠে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, বুকটা ছিলো চৌকাঠে, গলায় একটা রুমাল সাইজের সিলকের ফাঁস ছিলো।'

'বেশ! এই গেল এক নম্বর। তারপর?'

'শচীন মিত্র অর্থাৎ মহিলার স্বামী বারোটায় বাড়ি ফিরে এসে তা দেখতে পান।'

'দুই নম্বর। তারপর?'

'প্রতিবেশীরা খবর পেয়ে ছুটে আসে।'

'তাদের নাম?'

সুলতাদেবী যাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তার মধ্যে প্রথম নম্বর সুশোভন মুখার্জির পরিবার। তিনি যুদ্ধের ডাক্তার ছিলেন, বর্তমানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস, বয়েস ষাট। স্ত্রী নয়নতারা, বয়েস ছাপান্ন। বিধবা মেয়ে অশ্রুকণা আছে সেখানে। তার দুটি ছেলে, বড়ো ছেলেটির বয়েস উনিশ, সে বখে গেছে নাম রাম, খারাপ সংসর্গে মেলামেশা করে। ছোটোটির বয়েস পনেরো স্কুলে পড়ে।'

'বলে যাও—'

'তারপর সুহৃদ বটব্যাল। সুহৃদবাবুর বাড়িতে তিনি নিজে, তার স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং একটি নাতি। আর একজন আত্মীয় ছিলেন, তিনি ব্যবসায়ী। মাঝে মাঝেই আসেন। কিন্তু কিসের ব্যবসা তা ভালো করে কেউ জানে না।'

'পেট্রল পাম্পের জগমোহন সরকার, তার যুবতী অবিবাহিত মেয়ে যাকে সুলতাদেবী পড়িয়েছেন এবং ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছেন। খুনের আগের দিন রাত্রে জগমোহনবাবুর সম্পর্কিত একজন বৌদি এসেছেন।'

'আর ধীলন সর্দার এবং তিলক চ্যাটার্জি, এই তো?

'হ্যাঁ।'

'একটু ভাবতে দাও।'

'ভাবো।'

অমৃতা ভাবতে লাগলো। শুধু অমৃতাই নয় তার সঙ্গে রাকেশ সমাদ্দার এবং সুমিত্রাদেবীও ভাবতে লাগলেন। তিনজনই এমন নিস্তব্ধ-ভাবে ভাবছিলেন মনে হচ্ছিলো একাগ্র হ'য়ে প্ল্যানচেট আনছেন।'

প্রথমে রাকেশ সমাদ্দার মুখ খুললেন। বললেন, 'আমার যদ্দুর মনে হয় ঐ বটব্যালের বাড়ির অতিথিটির কর্ম। লোকটি বেশ সন্দেহজনক। নিশ্চয় চোরা চালানের ব্যবসা। টাকার জন্য এসব লোক সব করতে পারে। জেনেছে ঘরে টাকা আছে—কিন্তু একটা খটকা—'

'কী ?'

'টাকাটা তো রাত্তিরে চুরি যায়নি, গিয়েছে সকালে। তাই না ?'

'শচীনবাবুর কথায় বিশ্বাস করতে হলে ঠিক তাই—।'

সুমিত্রাদেবী কলকল ক'রে উঠলেন, 'তুমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে শচীনবাবুকে যতোই নির্দোষভাবে উপস্থিত করছো আমাদের কাছে। আমি বলছি সেটা তোমার গল্পের রহস্য বজায় রাখার কায়দা। খুনী ঐ শচীন মিত্রই। টাকা রেখেছেন কি রাখেননি সে আর কে দেখতে গেছে ? আসলে সকালেই যা করবার ক'রে কাজে চলে গেছেন আর এসেই নিজেকে নির্দোষ সাজাবার জন্য চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি এইমাত্র দেখলেন।'

'কিন্তু সকালে যে তিলক চ্যাটার্জি এসেছিলেন। যদি তার আগেই খুন ক'রে বেরিয়ে গিয়ে থাকেন তাহ'লে সুলতা তিলক চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বললেন কী ক'রে ?'

'তা-ও তো বটে। তাও তো বটে। তবে ঐ তিলক চ্যাটার্জিরই কর্ম।'

রাকেশ সমাদ্দার বললেন, 'ধীলনকেও আমি এ আওতা থেকে বাদ দিতে পারি না! ঐ আত্মীয় লোকটির সঙ্গে সাট ছিলো ধীলনের। ঐ জন্যই ভয়ে চিনিনা চিনিনা করছিলো।'

ইন্দ্রাণী অমৃতার দিকে তাকালো, 'তুমি কী বলো অমৃতা ?'

অমৃতা মৃদু হেসে বললো 'আমি কিছুই বলবো না শুধু বলবো শুধু ভাবাভাবির জন্য এতোটা সময় নিতে গেলে আজ আর গল্পটা শেষ হবে না। একবার ঘড়ির দিকে তাকাও—'

'তাইতো! ন'টা? এর মধ্যে ন'টা বেজে গেল?' ইন্দ্রাণী প্রায় চমকে উঠলেন।

সুমিত্রাদেবী ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'তোমাদের খাবার দেরি হ'য়ে যাচ্ছে না তো?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'তা নয়। সাধারণত দশটার আগে কোনোদিন খাই না। তবে পথঘাট নির্জন হ'য়ে গেলে তো আমাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

'নিশ্চয় নিশ্চয়—' রাকেশ সমাদ্দার দাঁড়িয়ে উঠলেন, 'এটা আবার একটা কথা নাকি? দেরি না হ'লেও সঙ্গে যেতাম।'

সুমিত্রাদেবী এক মিনিটের জন্য উঠে গিয়েই ফিরে এসে বললেন, আর কথা নয়, এবার গল্পটা শেষ হোক।'

রাকেশ সমাদ্দার আবার বসে পড়ে মাথা নাড়লেন 'ঠিক? গল্পটা শেষ হোক। ভদ্রলোককে দিয়ে কবুল করিয়ে নিলেন যে তিনি আর কখনো আপনাকে ফেমিনিস্ট বলবেন না, তারপর?'

ইন্দ্রাণী হাসলেন, 'তারপর খুব আশ্চর্যভাবে নয়নতারা দেবী এসে উপস্থিত—'

সুমিত্রাদেবী ভুরু কুঁচকোলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, বুঝে নিতে দাও। তুমি যখন তোমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলছিলে তখন দুপুর না বিকেল?'

'বলতে পারেন সন্ধ্যা। ও ফিরেছিলো বেলা পাঁচটায়, চায়ের পাট সাঙ্গ ক'রে সবে একটু কথাবার্তা বলছিলাম ঐ সময়েই নয়নতারা দেবী এসে বেল বাজালেন। মহিলাটি বেশ। আদবকায়দা জানেন, ভদ্রতা জানেন, দেখতে সম্ভ্রান্ত। বললেন, 'একটু খোঁজ নিতে এলাম। কিছু ফয়সালা হ'লো ব্যাপারটার?' বললাম, 'আপনারা সবাই সাহায্য করলেই কাজটা সহজ হবে।' উনি বললেন, 'কী সাহায্য করবো বলুন? এই রকম একটা নিরিবিলি ছোট শহরে, ততোধিক ছোট বাঙালী সমাজে যে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে ভাবাই যায়

না। অদ্ভুত ভয় ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সকলের মধ্যে। শুনছি আসল খুনীকে বার করার কাজটা আপনিই হাতে নিয়েছেন।'

বললাম, 'দেখুন, আমি তো গোয়েন্দা নই, গোয়েন্দা বিভাগে কাজও করি না, করেন আমার স্বামী।'

'তাহ'লেও তো কাজটা আপনি নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পাবেন। কাজটা আমি স্বেচ্ছায় নিয়েছি। আমার ভাবনা কেউ যেন অযথা হয়রাণ না হন।'

তিনি হাসলেন সেটা বোধহয় আপনি আটকাতে পারছেন না।'

'মানে?'

'আজ কদিন যাবত প্রায় সব সময়েই পুলিশ আমার দরজায় পাহারা দিচ্ছে।'

'তাই নাকি?'

'যে যখন যেখানে যাচ্ছে আসছে সবদা লক্ষ্য রাখছে। অসুবিধার মধ্যে মারাত্মক অসুবিধেটা হ'লো এই যে কাজের লোকজন আর আসছে না। ভীষণ ভয় পাচ্ছে তারা।'

'তা হ'লে তো সত্যিই খুব অসুবিধে।'

'সম্ভবত আমার বড়ো নাতিটার জন্যই এটা করেছেন ওঁরা, তবে আমি বলতে পারি এ কাজ তার দ্বারা সম্ভবই নয়। সুলতা মাসির কথা বলতে সে অজ্ঞান। সুলতার এই অপমৃত্যু আমরা সারা পরিবারই মুহ্যমান কিন্তু সে শোকার্ত। সত্যিই শোকার্ত।'

'ও।'

'তার মা তো ছেলের কথা ভেবে শয্যা নিয়েছে। আমার যতো যন্ত্রণা।'

'তাই তো।'

'সেজন্যই আপনার কাছে এলাম, যদি—'

'দেখুন পুলিশের কাজ তো পুলিশ করবেই আমি এখানে কেউ না; কোথাও নেই।'

'আপনারও কি মনে হয় আমার নাতি এর মধ্যে আছে ?'

'আপনি বাড়ি যান, মনে হচ্ছে দু'এক দিনের মধ্যে জানা যাবে কে এর মধ্যে আছে বা নেই।'

'আজ কদিনের ভিতর বাড়িতে কারো ঘুম নেই, খাওয়া নেই—'

'সে তো ঠিকই।'

'কী অশান্তির মধ্যে যে দিন যাচ্ছে—'

'স্বাভাবিক।'

'এমনিতেই তো বুঝতে পারছেন, একমাত্র কন্যার অকাল বৈধব্য সব সময়েই শেল বিঁধিয়ে রেখেছে বুকে, তার উপরে নাতিটি কেমন বিগড়ে গেল—'

'কী হ'য়েছিলো ওর বাবার ?'

'যে রোগের চিকিৎসা নেই, তাই। নইলে মেয়ের বাপ তো নিজেই অতবড়ো একজন ডাক্তার, তিনি ডাকলে তাঁর চেয়েও সব বড়ো ডাক্তারের সাহায্য অকাতরে পাওয়া যায়, করা হ'য়েছিলো সবই, রাখা গেল কি ? মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়েস, কী স্বাস্থ্য, কী পরিশ্রমী, কেমন চলে গেল ছ' মাসের মধ্যে ?'

'ক্যানসার ?'

'লিউকোমিয়া। ঐ একই তো ব্যাপার।'

'অত্যন্ত দুঃখের কথা। কদ্দিন হয়েছে ?'

'আটটা বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে।'

'একটু চা দিই ?'

'না না, আমি চা খেয়েই আপনার এখানে আসছি। শুধু বলতে এসেছিলাম, কাজের লোকজনকে যদি ওঁরা একটু অভয় দেন যে—'

'ভাববেন না, আর একটা কি দু'টো দিন সবুর করুন, সবই ঠিক হ'য়ে যাবে, সবই জানতে পারবেন।'

উঠলেন মহিলা। কিন্তু তিনি যেতে না যেতেই জগমোহন সরকার এসে হাজির। আমিই বসার ঘরে ছিলাম, আমার সঙ্গেই

দেখা হ'য়ে গেল। সংকুচিতভাবে বললেন, 'এস পি. সাহেব কুঠিতে নেই?'

আমি বললাম, 'না, উনি তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।'

আহাহা কী সুন্দর কুঠি। চারিদিকে তাকালেন তিনি, ইংরেজ, আমলে কী আমরা কখনো এই কুঠিতে ঢুকতে পারতাম? সাহসই হ'তো না। বন্দুকধারীরা তো সারাদিনই টান টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ সুপারেনটেনডেন্ট বলে কথা—।

দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলেন, ভিতরে পা দিলেন, 'আপনাদের মতো এমন অমায়িক নিরহংকার লোক আগে আর কেউ আসেনি। যদি অনুমতি করেন তো আপনাকে দু'টো কথা বলি।'

'নিশ্চয়ই, বলুন কী কথা?'

'বলেছিলাম যে—'

'আপনি বসুন না।'

'আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ। বলছিলাম যে আজ তো প্রায় আঠারো দিন হলো, মানে ঐ খুনের ব্যাপারটা আর কি।'

'তাতো হ'লো।'

'শহরের সকলেই জেনে গেছে পুলিশ সাহেব নয়, আপনিই কেসটা হাতে নিয়েছেন।'

'আপনার কাছে কি কোনো নতুন খবর আছে?'

'আজ্ঞে ঐ জন্যই আসা।'

'বলুন।'

আপনি নিশ্চয়ই জানেন ওঁদের বাড়িতে একটি মহারাস্ট্রিয়ান মেয়ে কাজ করতো।'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটি দেখতে ভালো, বয়সও এমন কিছু নয়—'

'বেশ তো।'

'তার সঙ্গে শচীনবাবুরও একটু ইয়ে ছিলো, আবার তিলক

চ্যাটার্জিরও বেশ ইয়ে টিয়ে মানে—' ভদ্রলোক লজ্জা লজ্জা ভাবে হাত কচলাতে লাগলেন।

বললাম, 'বুঝেছি।'

'আমি তো দেখুন সারাদিন থাকি না, দেখিও না, বুঝিও না যা শুনি তাই বলি।'

'কার কাছে শুনলেন?'

'যে সব নাম ধাম বলে লাভ নেই, মার্ডার কেস, শেষে কিসে থেকে কী হয় আমি বাবা সাতেও নেই পাঁচেও নেই। শুনেছি তাই বললাম। হয়তো কিছু সাহায্য হ'তে পারে।'

'আর কিছু কথা আছে?'

'তা আছে। সত্য কথা সেটা বলতেই এসেছি। ইনস্পেক্টর বলেছেন এখানকার যে কঘর বাঙালী আছে তারা যেন অনুমতি না নিয়ে শহরের বাইরে না যায়। কিন্তু আমার যে কয়েকদিনের জন্য একবার কলকাতা যাওয়া দরকার।'

'কবে যেতে চান?'

'ঐ জন্যই সাহেবের কাছে এসেছিলাম, যদি তিনি দয়া ক'রে আদেশ দেন। তা তিনি তো বাড়ি নেই, কিন্তু আপনি তো আছেন? আপনি যদি—'

হাসলাম, 'আমি তো চাকরি করি না? করেন আমার স্বামী। কাজেই এসব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কথা না হ'লে কিছু হবে না। বিনয়ে গলে গিয়ে বলবেন, আজ্ঞে ঐতো আমার একটা মেয়ে, তার বিয়ের জন্যই বড়ো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। বেচারার মা তো নেই, একা একা থাকে, তবু বিয়ে হলে একটা ভরা ঘর পায় সঙ্গী পায়। পারছি কই। এই সুদূর বিদেশে বাঙালী পাত্র কোথায়? কলকাতার এক আত্মীয় এবার প্রায় একটা ঠিক করে ফেলেছেন। এখন আমাকে যেতে হবে, দেখতে হবে, শুনতে হবে, বুঝতে হবে—মেয়ে তো, যে কোনো ভাবে তো তাকে বিদায় দেওয়া যায় না?'

'তাই তো।'

'সত্য কথা বলবো মা ? সুলতাদেবী সেদিক থেকে আমার মেয়ের একটা মস্ত ভরসা ছিলেন। কী কাণ্ড হ'য়ে গেল।'

'আপনি আর দুটোদিন অপেক্ষা করুন, আশা করছি তার মধ্যেই বোঝা যাবে কার দ্বারা এই নিষ্ঠুর কর্ম সম্ভব হয়েছে, তারপর সবাই আপনারা স্বাধীনভাবে যে যেখানে যাবার যাবেন। তার আগে শহর ছেড়ে এঁরা নড়তে দেবেন বলে মনে হয় না।'

ভদ্রলোক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটু পরে বললেন, 'শুনলাম কাল একবার আমাদের ঐ রাস্তায় আপনি গিয়েছিলেন। আমার মেয়ে তো আপনার কথা বলতে অস্থির। তার খুব ইচ্ছে ছিলো একটু ভিতরে আসেন, সময় ছিলো না বোধ হয় ?'

'না, একেবারেই না। নানা কাজেই আমাকে ও রাস্তাটায় যেতে হয় আজকাল, দেখলাম আপনাব মেয়ে আপনার বৌদির ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে শচীনবাবুদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে—।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আজকাল ঐ করে। ঐ জানালা দিয়েই ওদের শোবার ঘরের মধ্যিটা দেখা যায় তো ? সুলতাদেবী ওখানেই ঘুরতেন ফিরতেন কাজ করতেন, বারান্দার এদিকে এসে চেঁচিয়ে কথা বলতেন ওর সঙ্গে। বড়ো স্নেহ করতেন ওকে। তাঁর মৃত্যুতে ও বলতে গেলে আর একজন মা হারিয়েছে। কাকিমা বলতে একেবারে অস্থির ছিলো। আর শচীনবাবুকেও তো কাকা বলতে অস্থির। সেই কাকা এখন কী অবস্থায় আছেন ? আবার এদিকে লোকেরা তো তাঁকেই সন্দেহ করছে কিনা ?'

'হ্যাঁ আপনিও তো বললেন, সেই মহারাষ্ট্রীয়ান বাঈয়ের সঙ্গে—'

'তাইতো শুনছি কিনা ?'

'তার মানে এই তো বলতে চাইছেন যে এসব দোষ যখন ছিলো তখন স্ত্রীর সঙ্গে খিটিমিটি হবেই, একটা আক্রোশেই পর্যবসিত হবে সম্পর্কটা, সেই ক্ষেত্রে খুন খারাপি হতে বাধা কোথায় ? তার উপরে

তিলক চ্যাটার্জির মতো একজন লোক যেখানে তৃতীয় ব্যক্তি।'

তাই তো। তবে দেখুন এটা বলতে পারি, আমি নিজে যতটুকু জানি, শচীনবাবুর মতো এরকম একজন শান্ত ভদ্র মানুষ খুব কম আছে সংসারে। আমি আর আমার মেয়ে ওঁদের দুজনকেই খুব শ্রদ্ধা করি, সুলতাদেবীর মৃত্যু আমাদের দুজনকেই খুব কষ্ট দিয়েছে। মেয়ে এখনো কেঁদে ফেলে বলতে বলতে। তা হ'লে এখন উঠি?

'আসুন।'

'ঠিক কখন এলে সাহেবকে পাওয়া যাবে? এখনতো মাত্র সাড়ে সাত, যদি আটটা নাগাদ আবার আসি?'

'আমি বলছি কি আপনি বরং মিস্টার পাঞ্জার সঙ্গেই দেখা করুন উনি অনুমতি দিলেই হবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

১৯

চলে গেলেন জগমোহন। কিন্তু ঘরে এসে বসতে না বসতে পদ্মা এসে হাজির। 'মেমসাব্ বটব্যাল সাবকো কুঠি থেকে মাইজি এসেছেন।' কী বিড়ম্বনা। সবে নোট বুকটা খুলে ঘটনাটা সাজাতে বসেছিলাম। একবার ভাবলাম বলি যে অসুস্থ আছি দেখা করতে পারবো না। তারপর আবার ভাবলাম, একথা বলা মানেই এতোখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে আসা বয়স্ক মহিলাটিকে রীতিমতো অপমান করা। বিরক্তচিত্তে উঠলাম টেবিল চেয়ার ছেড়ে। ভেবেই পেলাম না এরা সবাই মিলে ছুটে ছুটে আসছেন কেন বাংলোতে।

আমাকে দেখেই সবিনয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহিলা, বললেন, 'একটা কথা বলতে এলাম।'

'আমি বললাম, 'বসুন।'

বসলেন, বললেন, 'আচ্ছা আপনাদের কোনো লোক কি এর মধ্যে চুনারে গিয়েছিলেন?'

'কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো?' আমি প্রায় প্রকাশ্যেই অসন্তুষ্ট ভাব দিয়ে ভুরু কুঁচকালাম।

মহিলা বললেন, 'আমার বাড়িতে আমার যে আত্মীয়টি ছিলো তার স্ত্রী চিঠি লিখেছে।'

'কী লিখেছেন?'

'এখানকার খুনের কেসটা তো জানে? আমাদের জামিন রেখেই আমাদের আত্মীয়টি তার কাজের জন্য চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাড়ি গিয়ে একদিন থেকেই আবার চলে গেছে অন্য শহরে। কয়েকদিন আগে কে একজন মহিলা গিয়ে নাকি সেই আত্মীয়টি বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে খোঁজ খবর নিয়েছে।'

বললাম, 'দেখুন, এইটুকু জায়গায় এরকম একটা ঘটনা নিশ্চয়ই খুব অস্বাভাবিক, বিশেষত একজন মহিলাকে খুন করা, যে মহিলার কোনো প্রত্যক্ষ শত্রু ছিলো না। খোঁজ খবর তো নিতেই পারে। কিন্তু আমাকে এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'ওরা খুব ভয় পাচ্ছে। ঘটনা ঘটেছে এখানে, খোঁজ খবর হচ্ছে সেখানে, সেটা তো ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

'আমি এসব বিষয় কিছুই জানি না। যাদের কাজ তারা কী করছে না করছে আমার তা জানবার কথা নয়।'

সকলের মতো ইনিও বললেন, 'এটা তো আপনিই হাতে নিয়েছেন কিনা তাই আপনাকেই বলতে এসেছি। নইলে আমার সাহস কি যে এস পি সাহেবের বাংলোয় তাঁর কাছে আসি। আপনি একজন মেয়ে, সহজভাবে মেশেন আমাদের সঙ্গে, এ ব্যাপারে দু' একদিন গেছেন, সেজন্যই—'

'মাপ করবেন, আমি আমার ব্যক্তিগত সদিচ্ছায় যে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছি তার সঙ্গে এস পি সাহেব বা তাঁর আপিশের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। কাজেই তাঁরা কোথায় কীভাবে কোন টোপ ফেলেছেন এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলা আর দেয়ালে করাঘাত একই ব্যাপার।'

এরপরে আর বিশেষ কথা জমলো না। একটু বাদেই উঠলেন মহিলা। আমিও তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে পেরে বাঁচলাম।

রাকেশ সমাদ্দার বললেন, 'ও, বুঝেছি।'

'কী বুঝেছেন?'

'বললেন যে চুনারে গিয়েছিলেন, নিশ্চয়ই এ কাজেই গিয়েছিলেন?'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'আর কি! দুর্গ টুর্গও দেখা হ'লো, কাজও হাসিল হ'লো।'

সমাদ্দারও হেসে বললেন, 'খোঁজ খবর যিনি নিচ্ছিলেন সেই মহিলাটি কে?'

'ঐ একজন আটপৌরে প্রতিবেশী। রিফিউজিও বলতে পারেন। তাঁরা তো সর্বত্রই আছেন।'

'তার মানে ছদ্মবেশও ধ'রে ফেলছিলেন?'

'তা একটু আধটু ধরতে হ'লো বৈ কি।'

'বাব্‌বা, তুমি তো দেখছি বড়ো সোজা মেয়ে নও—' সুমিত্রা দেবী সাংঘাতিক উত্তেজিত 'বলো বলো তারপর?'

'তারপর দেখলাম ভদ্রলোকটি অনুপস্থিত, সংসারে পাঁচটি সন্তান সহ দুই পত্নী বর্তমান।'

'দুই পত্নী?'

'একজনের বয়েস প্রায় চল্লিশ, অন্যজন অষ্টাদশী।'

'তার মানে?'

'মনে হ'লো চুলোচুলি বিশেষ নেই। আরো জানলাম, সম্পর্কে এরা শুধু সতীনই নয়, দুই সহোদরাও বটে।'

'বলছো কি?'

'আসলে মায়ের মৃত্যুর পরে মাতৃতুল্য এই বড়ো বোনটি ছোটো বোনটিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়ে এসেছিলো নিজের কাছে। ভগ্নিপতি খুব ভালোমতোই রক্ষা করেছে সন্তানসম্ভবা ক'রে দিয়ে। জানাজানি হ'য়ে গেলে তখন বড়ো বোনই স্বামীকে বাধ্য করেছে বিয়ে করতে।'

'এ দেখছি আর এক গল্প। তারপর ?'

'বুঝতেই পারছেন বিবেক বিবেচনাতে বিশেষ পোক্ত নয় লোকটি। আর ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটাও খুব পরিষ্কার নয়। চোরা চালানীদের সঙ্গে যথেষ্ট যোগসাজোস।'

'তাই নাকি ? বটব্যালরা জানতেন না ? না কি জেনেও লুকিয়েছেন ?'

'বোধহয় জানতেন না। ওঁরা লোক খারাপ নন। আত্মীয়টি বছরে এক আধবার এসে ওঠে এই পর্যন্তই পরিচয়। পারিবারিক ভাবে কখনোই দেখাশুনো নেই, লোকটি যা বলে তাই শোনে, তাই বিশ্বাস করে।'

'কিন্তু চিঠিটা তো ওর স্ত্রী-ই লিখেছিলো ?'

'হ্যাঁ। ঐ বড়ো স্ত্রী লিখেছে। বড়ো স্ত্রীর কথাটাই এঁরা জানেন, ছোটো স্ত্রীর কথাটা জানেন না।

'তারপর ?'

এখানে রাকেশ সমাদ্দার হাসলেন, তারপর ছদ্মবেশিনী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী মুখার্জি বাড়ি এসে নোটবুকে লিখলেন—'

কথা শেষ করতে না দিয়ে ইন্দ্রাণীও হাসতে হাসতে বললেন, মামলার নিষ্পত্তি শেষ, খুনী ধরা পড়েছে।'

'পড়লো বৈ কি। আমি কিন্তু আগেই একে সন্দেহ করেছিলাম।'

'আর একটু বাকী আছে গল্প শেষ হ'তে।'

'তাতো আছেই। কেবলমাত্র কে খুনী বা কে ডাকাত এটা বললেই তো হবে না ? ব্যাখ্যা তো চাই ?'

'তাই তো। আর সেজন্যই শোবার ঘরে এসে নোটবুকে শেষ কথাটি লিখলাম।'

'কি আপনার শেষ কথা তাড়াতাড়ি বলুন, মিলিয়ে নিই।'

'নোটবুকের লেখা সাঙ্গ হলো ছোটো একটা ছবিও আঁকলাম।'

'কিসের ছবি ?'

যেভাবে যেভাবে কাজটা হ'তে পাবে তার ছবি এবং যার দ্বারা সম্ভব তার ছবি।'

অমৃতা বললো, 'দিদির এই ছবি আঁকাটাই কিন্তু দিদির আসল চাবি। সুমিত্রাদির বাড়ি নিয়ে যে হাঙ্গামা হচ্ছে সেই রহস্যও কিন্তু ঘরে বসে ঐ ছবির সাহায্যেই বার ক'রে ফেলবেন।

'সত্যি ?' সুমিত্রা দেবী অবাক, 'ছবিতে তুমি কী আঁকলে কাকে আঁকলে ?'

ইন্দ্রাণী হাসলেন, 'এটা তো শেষ ছবি। প্রথম থেকে প্রায় তেত্রিশখানা ছবি আমি এঁকেছিলাম এই কেসটার জন্যে। এখন হ'লে ঐ তেত্রিশের জায়গায় তিনখানা হ'লেই ধ'রে ফেলতাম।'

'এতো ওস্তাদ হ'য়ে গেছ।'

'আন্দাজ। সবই আন্দাজ। কিছুদিন চর্চা করলেই এই ধরণের অনুমান শক্তি বেশ প্রখব হ'য়ে ওঠে। একজন মানুষের মুখের দিকে পাঁচ মিনিট তাকিয়ে থাকলেই দেখবেন তার মনটাকে অনেকখানি আপনি ধ'রে ফেলেছেন।'

'তোমার ছবিতে তাহ'লে কাব চেহারাটা ধরা পড়লো ?'

'য'বটা পড়েছিলো আমি তখুনি তাব বাড়ি গেলাম।'

'কার বাড়ি কার বাড়ি ?'

'গিয়ে দেখলাম যথারীতি জগমোহনবাবু বাড়ি নেই।'

'এঁ্যা। শেষে জগমোহন ? ঐ ভালো মানুষ জগমোহন ?'

'থাকবার কথা নয় জানতাম। ঐ সময়ে ঐ দিনে সাধারণত তিনি শহর থেকে দু'মাইল দূরে সাপ্তাহিক হাটে যান, সস্তায় বাজার ক'রে আনেন।'

'তারপর তারপর ?'

'দেখলাম তার মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আমাকে দেখে সংকুচিত হ'য়ে এগিয়ে এলো।'

'মেয়েও জানতো ?'

'আমি তার আড়ষ্টতা ভাঙবার জন্য বললাম, বাবা কি বিয়ে ঠিক করতে কলকাতা চলে গেছেন নাকি?' সে সলজ্জভাবে একটু হাসলো। তারপরেই উদ্বেগের স্বরে বললো, বাবাকে আপনারা আটকে দিয়েছেন কেন?'

'কে আটকে দিয়েছে?'

'থানা থেকে বলেছে, উনি যেন শহর ছেড়ে এক পা না নড়েন।'

'বলেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে তোমার খুব রাগ হ'য়েছে না?'

'না, রাগ কেন হবে।'

'বিয়েটা যদি ভেঙে যায়!' আমার সকৌতুক ঠাট্টায় সামান্য আরক্ত হ'লো বটে কিন্তু ভয় ভাঙলো না। কী বলতে গিয়ে থেমে থেকে বললো, শচীনকাকা বলছিলেন, শুধু বাবাকেই নয় পুলিশ নাকি তাঁকেও বারণ করেছে শহর ছাড়তে, সত্যি?'

আমি বললাম, 'খুনের একটা কিনারা হওয়া তো দরকার? তার জন্য যে কোনো সময় যে কোনো লোকেরই সহায়তার প্রয়োজন হ'তে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'সেজন্য তুমিও বন্দী।'

'আমি? আমিও শহর ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না?'

'না।'

'আমি কি সহায়তা করতে পারি?'

'যেমন বলতে পারো তোমার জ্যাঠাইমা এখন কী করছেন।'

এবার হেসে ফেললো মেয়েটি। বললো, এটাও সহায়তা?'

'হ্যাঁ এটাও সহায়তা।'

'তাহ'লে বলি জ্যাঠাইমা এখন চান করছেন।'

'তাহ'লে উনি চান ক'রে আসুন, একটু বসি।'

'ওমা, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' তাড়াতাড়ি কাঠের চেয়ারটা নিজের আঁচল দিয়ে ঝেড়ে এগিয়ে দিল। বললো, একটু চা করি ?'

'কিছু দরকার নেই। বরং বোসো, আর একটু সহায়তা করো।'

আমাকে বসিয়ে নিজেও বসলো। হাসলো। আমি বললাম, 'জ্যাঠাইমাকে তাহ'লে ফিরে যেতে দাওনি ? ধরে রেখেছো।'

'ধ'রে রেখেছি ? আমরা ? না। জ্যাঠাইমার ভীষণ জ্বর হ'য়েছিলো, একশো তিন-চার। দু'দিন তো জ্ঞানই ছিলো না। বাবা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। আমারও কান্না পাচ্ছিলো। তার মধ্যে জ্যাঠাইমা চলে যাবার জন্যে অস্থির। মাত্র দু'দিনের জন্য এসেছিলেন তো ? বাড়িটারি খুলে চলে এসেছেন—একটা সেলাইয়ের স্কুল চালান, ছাত্রীরা এসে ফিরে গেলে ক্ষতি।'

'খুব সেলাই করেন বুঝি ?'

'জ্যাঠাইমার মতো ভালো সেলাই খুব কম লোক জানে।'

'তুমি শেখোনা ?'

'শিখি। সেলাই আমার বেশী ভালো লাগে না।'

'ঐ জ্বর নিয়েই চলে যেতে চাইছিলেন ?'

'হ্যাঁ। একদিন রওনাও হ'য়েছিলেন।

ঘরের চৌকাঠেই মাথা ঘুরে পড়ে যান। আসলে সুলতা কাকিমার ঐ রকম অপমৃত্যুতে ভীষণ ভয় পেয়েছেন। প্রলাপের মধ্যে কতো কতো কী বলছিলেন।'

'কী বলছিলেন ?'

'যতোসব উদভট ভয়ের কথা। আমারও রাত্তিরে গা ছমছম করতো।'

'এখন কেমন আছেন ?'

'এই তো মাত্র কাল একটু উঠতে পেরেছেন, আর আজই বলছেন চলে যাবেন।'

'সেজন্যই চান করতে গেছেন।'

'হয়তো ঠিক চান কববেন না। হাত পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নেবেন। কিন্তু বলুন তো ওভাবে কি যেতে দেয়া যায় ?'

'তবে দিচ্ছ কেন ?'

'কথা শুনছেন নাকি ? বাবা বাড়ি থাকলে তবু যদি বা ঠেকাতে পারতেন, আমি তো পারবোই না।'

'তাহ'লে আমি ঠেকিয়ে দি।'

মেয়েটি উজ্জ্বল হ'লো, 'ঠিক বলেছেন। জ্যাঠাইমাকেও বলে দিন, তিনিও শহর ছেড়ে এক পা নডতে পারবেন না।'

'তাহ'লে দেখে এসো চানটা হ'লো কিনা। চলো না ওঁর ঘবে গিয়েই বসি।'

'চলুন'

২০

ঘরে আসতে আসতেই দেখলাম, বাথরুমের দরজা খোলা। তাব মানে চান হ'য়ে গেছে। ঘবেব দরজায় এসে দেখলাম ভেজানো। মেয়েটি মৃদু কবাঘাত ক'রে বললো, 'জ্যাঠাইমা, ঘবে আসবো ?'

ভিতর থেকে আওয়াজ এলো 'আয়।'

আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢোকায় অপ্রস্তুত হ'লেন। দেখলাম একটা মটকার শাড়ি পড়েছেন, চুল আঁচড়ে বেঁধে নিয়েছেন, পোটলা পুটলি গুছোচ্ছেন। অর্থাৎ যাবার জন্য তৈরী।

মেয়েটি বললো, 'তুমি কি বাবা আসা পর্যন্তও অপেক্ষা করবে না ?'

মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'আসুন। আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি, আমার বাস আব খানিকক্ষণের মধ্যেই ছেড়ে যাবে। কথা বলবো তার অবসর নেই।'

'শুনলাম আপনি খুব জ্বরে ভুগে উঠলেন, এখনো তো তেমন সুস্থ হননি। তবে যাচ্ছেন কেন ?'

'উপায় নেই দিদি। সংসার লণ্ডভণ্ড।'

'থাকেন তো একা, সংসার তো আপনি নিজে। সেই আপনি নামের সংসার তো আপনি যেখানে থাকবেন সেখানেই হবে।'

'তা হয়? জীবিকা আছে না? বেঁচে থাকতে হ'লে গ্রাসাচ্ছাদনেরও তো বন্দোবস্ত থাকা দরকার?'

'সেলাইয়ের স্কুল আছে, না?'

'হ্যাঁ। কাউকে কিছু না বলেই তো পূজো দিতে একদিনের জন্য চ'লে এসেছিলাম, এমন অসুস্থ হ'য়ে পড়লাম যে—'

এখানে বাধা দিয়ে আমি বললাম, 'তা না হ'লেও আপনার যাওয়া হ'তো না।'

'বলছেন এরা আটকে দিত?' হাসলেন, 'না, এরা জানে কাজ না থাকলে যাবার জন্য অত অস্থির হ'তাম না।'

আমিও হাসলাম, 'ওরা আটকাক না আটকাক পুলিশ তো আটকাতো।'

'কেন?'

'শুনছি তো শহরের সব কটি বাঙালী পরিবারের গতিবিধিই ইন্‌স্‌পেক্‌টার নিয়ন্ত্রিত করছেন।'

'আমি তো এই শহরের লোক নই।'

'ঘটনার সময় তো উপস্থিত ছিলেন।'

'তাতেই আমাকে আটকে দেবে?'

'অন্তত পারমিশন লাগবে বেরুতে গেলে।'

'ও পারমিশন! তা আমার দিদিই যেখানে রাণী সেখানে তাঁর অধম বোনটিকে তিনি নিশ্চয়ই উদ্ধার করবেন।'

'ভদ্রমহিলা সব গুছিয়ে ব্যাগটি হাতে নিয়ে এগুলেন 'তা হ'লে আসি।' এটা আমার দিকে তাকিয়ে। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাইরে, বাবাকে বলিস ভীষণ প্রয়োজন না থাকলে এভাবে কখনোই যেতাম না।

প্রায় দরজার বাইরে পা দিয়েছিলেন, আমি সামনে আগলে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আপনার কিন্তু যাওয়া হবেনা।'

হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'যাওয়া হবেনা মানে?'

'যেতে দেয়া হবেনা।'

,আমাকে যেতে দেয়া হবেনা ?

'না।'

হঠাৎ রেগে গিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমি জানিনা আপনি আমার সঙ্গে কোনো রকম ঠাট্টা তামাসা করছেন কিনা। আপনারা বড়োলোক, আমরা গরীব, আপনাদের কোনটা রসিকতা কোনটা সত্য, কোনটা পিঠ চাপরানো কোনটা ভয় দেখানো কিছুই হদিশ পাওয়াই আমাদের সাধ্যের অতিত। কিন্তু আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়।

আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলাতে জগমোহনের মেয়েটি খুব সংকুচিত বোধ করলো। ব্যস্ত হয়ে বললো জ্যাঠাইমা, তুমি ওঁকে এরকম বলছো কেন? উনি তোমার শরীর খারাপ জেনেই তোমাকে যেতে দিতে চাইছেন না। মাসিমা আপনি বসুন, আপনি কিছু মনে করবেন না। জ্বর হ'য়ে থেকে জ্যাঠাইমা একটু কেমন হ'য়ে গেছেন।

জ্যাঠাইমাও জল হলেন, বিনীত ভাবে বললেন, মুকুল ঠিক কথাই বলেছে দিদি, আমি সত্যি একটা ঘোরের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।

আমি বললাম, 'স্বাভাবিক।'

অস্থির হয়ে বললেন, 'কেন কেন ? স্বাভাবিক কেন ?

'বাড়ির উল্টোদিকেই এরকম একটা ঘটনা।'

'তাইতো।'

'তার উপর কে খুন করেছে এখনো তার কোনো হদিস হ'লো না'

'তাইতো।'

'আর ঐ জন্যেই আপনাকে যেতে দেয়া হবেনা।'

হেসে বললেন' 'মুকুল যা বলেছে আমি তা মানি। আমার

শরীর খারপ বলেই আপনি উদারতা বশত আমাকে যে ভাবে পারেন বিশ্রামের জন্য যেতে দিতে চাইছেন না কিন্তু সত্যি দিদি—' হাত ধরলেন, 'আমার কোনো উপায় নেই থাকার। আপনি জানেন না এবা জানে, একটা সেলাইয়ের ইশকুলই আমার গ্রাত্রাচ্ছাদনেব একমাত্র বাস্তা। যে ভাবে রেখে এসেছি হয়তো গিয়ে দেখবো সর্বস্ব গেছে.।

আমি জানি আপনি খুব ভালো সেলাই করেন। এ-ও জানি খুব পান খান আব পানে সঙ্গে জর্দা' কী জর্দা এটা? ভারি সুন্দর গন্দ।

সগর্বে বললেন, 'বাদল রায়েব সুগন্ধি কিমাম আর বলেন কেন, গরীবের ঘোড়া বোগ। এই ছোট্ট একটু কৌটো, কতো টুকুবা থাকে কী চড়া দাম। কোমরে ঝুলে থাকা একটা বড়ো রুমাল দিয়ে ঠোঁটের দু'পাশ থেকে কথা বলতে বলতে গড়িয়ে পড়া পানের রসটা মুছে নিলেন। ব্লাউসের ভিতর থেকে গ্রামোফোনের পিন রাখা কৌটোর চেয়েও ছোটো একটা কৌটো দেখিয়ে বললেন, 'অথচ এই কৌটোটি আমার চাই-ই চাই। এটিই আমাব প্রাণ। আচ্ছা তা হলে আসি? আবার যাবার জন্য পা বাড়ালেন। আবর আমি বাঁধা দিয়ে বললাম উঁহু।'

'মানে?'

'মানে এখন আপনার যাওয়া হবে না।'

'আপনি কি সত্যি আমাকে আটকাতে চাইছেন?

'হ্যাঁ।'

'আইন বলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে এই ঘটনার কতোটুকু যোগ বলুন তো?

'যোগ বিয়োগের কথা নয় নিয়মের কথা।'

'আমি এখানে থাকি না, একদিনের জন্য এসেছি, তা-ও প্রায় রাত

সাড়ে ন'টায়। সকালে মন্দিরে গেছি, ফিরে এসে দেখি এই ঘটনা এর মধ্যে আমি কোথায় ?

'কে যে কোথায় কী ভাবে থাকে কেউ জানে না।'

'আমিও থাকতে পারি বলে আপনার ধারণা ?'

'ধরুণ না তাই।'

'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এই পরিহাসটা আমি ঠিক হজম করতে পারছি না। সুলতাদেবীর মৃত্যু এ পরিবারের সকলের কাছেই অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তা নিয়ে এভাবে কথা বললে আমি কান্না রাখতে পারবো না।' বলে সত্যিই তিনি কেঁদে ফেললেন।

এখানে সুমিত্রাদেবী বললেন, না ভাই, দেওরের জন্য তার বৌদি-কে ওভাবে গুলি করা তোমার উচিত হয়নি।' রাকেশ সমাদ্দার বললেন, গুলি করা বলছেন কেন, খবরাখবর ওঁর কাছ থেকেও নিতে হবে তো ? অন্তত জগমোহন যতক্ষণ না ফেরে।'

তা বটে। বলো, তারপর ?

'ঠিক এই সময়েই জগমোহনের গলা শোনা গেল, 'কই রে মুকুল আয় দেখবি আয়, বৌদি কি চলে গেছে নাকি ? কী মস্ত মস্ত মাগুর মাছ এনেছি। জিইয়ে রাখবি আর খাবি।'

বাঃ, আসল নায়ক এসে গেছে রঙ্গমঞ্চে ? রাকেশ হাসলেন, সুমিত্রাদেবীও হেসে বললেন, লোকটার কলজের জোর আছে বলতে হবে। ঐ রকম একটা ভয়ঙ্কর কাজ করার পরেও কেমন চলছে, ফিরছে। আবার হাটবাজার ক'রে নিয়ে এলো—।

'বলো বলো, কী হ'লো তারপর।'

'ভিতরে ঢুকে এলেন জগমোহনবাবু, আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, তারপরই সহজ হয়ে বললেন, আপনি এসেছেন! ও। কতোক্ষণ ?' দাঁড়িয়ে কেন ?

আমিও সহজ ভাবেই হেসে বললাম 'আপনার বৌদিকে আটকাচ্ছি,

এই অসুস্থ শরীরে যাওয়া কি উচিত। মুকুল বলেছে ওঁর পণ উনি যাবেনই।

জগমোহনবাবু পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। ভদ্র-লোককে আমি তিনদিন দেখলাম, মনে হলো ঘন ঘন রুমালে মুখ মোছা একটা বদভ্যাস।'

এখানে হাটুতে চাপর দিলেন রাকেশ সমাদ্দার। হাত থেকে তাঁর চুরুট খসে পড়লো। বললেন ঐ রুমালের মালিক তাহলে এই ব্যক্তি? ইন্দ্রাণী বললেন, 'ঠিক। প্রথম যেদিন ওদের বাড়ি যাই সেদিন ও তিনি বাজার থেকে ফিরে এসে এভাবে এই রুমাল দিয়েই মুখ মুছেছিলেন। সন্দীপ লক্ষ্য করেনি কিন্তু আমার চোখ থেমে গেল রুমালটির দিকে তাকিয়ে। আমি দেখলাম, এটা সেই একই সিলকের শাড়িকাটা রুমাল। যার হুবহু আর একটি টুকরো সুলতা মিত্রর গলায় ফাঁসি হয়ে বিরাজ করছিলো। তবে সেটা ছিলো না সেলাই করা একটা বড়ো টুকরো মাত্র, এটা খুব সুন্দরভাবে সেলাই করা। কোনে আবার এমব্রয়ডারি করে নামের আদ্যক্ষরের মনো-গ্রাম। আমি বললাম, আপনার রুমালটি তো বড়ো সুন্দর। জগ-মোহন বাবু গদগদ হ'য়ে বললেন, আমার বৌদির উপহার। বৌদি দারুণ সেলাই করে। মুকুল হেসে বললো, আমাকেও একটা ব্লাউস করে দিয়েছেন এই কাপড় দিয়ে। আমি বললাম এটা কার শাড়ি ছিলো? মুকুল মুখ নিচু করে বললো, আমার মার। ছিঁড়ে গিয়ে-ছিলো, জ্যাঠাইমা বললেন, এতে ভালো সিলক্, দে তোর বাবাকে দুটো রুমাল ক'রে দি। তোরও একটা ব্লাউস হয়ে যাবে। আর ছেঁড়া টুকরোগুলো আমার পানের রস মোছার কাজে লেগে যাবে।

এই সময়ে মুকুলের জ্যাঠাইমা আবার যাবার চেষ্টা করে ব্যস্ত হয়ে বললেন, ঠাকুরপো, আমার তো আর দেরী করা চলে না, বাস তো এখনি ছেড়ে যাবে।'

'জগমোহন বললেন, যাবেনই ?'

বৌদি বললেন, যেতেই হবে।

'তাহলে মা মুকুল তুমি মাসিমাকে একটু চা করে দাও। ভালো মিষ্টি এনেছি। ছাখো থলিতে, এক মিনিট বস্থন আপনি। আমি এক্ষুণি ফিরে আসছি বৌদিকে একটা সাইকেল রিকশায় তুলে দিয়ে।'

এখানে স্থমিত্রাদেবী বলে উঠলেন, বাঃ পালাবার মতলবটিতো বেশ করেছে।'

রাকেশ সমাদ্দার বললেন. 'পালিয়ে যাবে কোথায়? মেয়ে আছে না?

স্থমিত্রাদেবী বললেন এদের আবার মেয়ে আর বৌ। নিজের প্রাণ বাঁচানোই তখন আসল কথা। দরকার হ'লে মেয়েকে গলা টিপতে কতোক্ষণ।

রাকেশ বললেন, লোকটা বোকাও আছে। রুমালটা লুকোবে তো?'

স্থমিত্রা বললেন, 'তাড়াহুড়োতে যে একই কাপড়ের টুকরো দিয়ে ফাঁস দিয়েছে সে কথা কি মনে আছে নাকি? মনে থাকলে কখনো দেখায়?'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমি আবার যাওয়াটা আটকে দিয়ে বললাম, জগমোহনবাবু, আপনার বাড়িতে আসিনি, এসেছি কাজে।' হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই সে তো নিশ্চয়ই। আপনার মতো মানুষ কি আমাদের মতো লোকের ঘরে যখন তখন বেড়াতে আসতে পারে?'

'স্থতরাং আপনি বা আপনার বৌদি কেউ এখন বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করবেন না।'

হঠাৎ ভয়ে নীল হ'য়ে গেলেন জগমোহন, গলা ভেঙে গেল, ঢোক গিলে বললেন, 'বেরুবো না?'

'না।'

'কী করবো ?'

'সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবেন।'

বৌদি হঠাৎ আমাকে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাকিয়ে দেখে আমি বললাম, 'লাভ নেই। বাড়ির চারদিকে পুলিশ ঘিরে আছে আর এটাও সঙ্গে আছে—'আঁচলের তলা থেকে ছোট্ট আগ্নেয় অস্ত্রটি এবার আমি বার করলাম।

২১

'তুমি কিন্তু মশা মারতে কামান দাগাচ্ছো। কাজটা করলো জগমোহন, আর বেচারা বৌদি হঠাৎ এসে পড়েছে বলে তাকেও জড়ালে। আবার সুমিত্রাদেবীর সহানুভূতি, গলা শোনা গেল। রাকেশ সমাদ্দার ভ্রুকুটি করলেন, 'দেখুন, এসব কাজ একজনের দ্বারা সম্ভব হয় না। নিশ্চয় বৌদিরও সাট্ ছিলো।'

'সাটটা কখন হবে শুনি?' তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন তিনি, 'এলেন রাত ন'টার সময়, মাথা ধরেছে বলে শুয়ে থাকলেন, দেওরের সঙ্গে তো তখন কুশল প্রশ্ন ছাড়া আর কোনো কথাই হ'লো না। তারপর তো ভোর না হ'তে বেরিয়ে গেলেন পূজো দিতে।'

রাকেশ বিজ্ঞভাবে বললেন, 'আরে ঐ রকম ভাবেই যা বলার বলা হ'য়ে যায়। এদের বিষয়ে তো আপনার কোনো ধারণা নেই। বলুন মিসেস মুখার্জি, শেষটা কী হ'লো। তিনি অধীর উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন ইন্দ্রাণীর দিকে। ইন্দ্রাণী বললেন, 'বৌদি দাঁড়িয়ে গেলেন কিন্তু পিস্তল দেখে আর বাড়ির চারিদিক পুলিশ ঘিরেছে শুনে জগমোহনবাবু এমন হাউমাউ ক'রে উঠলেন যে বলবার নয়। মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আমার পা জড়িয়ে বলতে লাগলেন, বাঁচান, বাঁচান, আপনি আমাকে বাঁচান, আমার মেয়ের মুখ চেয়ে আমাকে ছেড়ে দিন।'

আমি মুকুলকে বললাম, 'মুকুল, সামনেব দরজা বন্ধ ক'রে দাও।' মুকুল একটা মরা মানুষের মতো হেঁটে গিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়ে এলো।।

জগমোহনকে বললাম, আপনি চুপ করুন।' বোধহয় পিস্তলের ভয়েই চুপ ক'রে কাঁপতে লাগলেন ঠক্ ঠক্ ক'বে বৌদিকে বললাম, বসুন. যা জিজ্ঞেস করবো জবাব দিন।' বৌদি বসলেন। চোখে চোখ বেখে বললাম, 'খুন তো কবেছেন, টাকাটা কোথায় ?'

'এ্যাঁ!'

'হ্যাঁ!'

সুমিত্রাদেবী এবং রাকেশ একসঙ্গেই প্রায় এই বিস্ময়বোধক শব্দটি উচ্চারণ করলেন।

ইন্দ্রাণী মৃদু হেসে বললো সেদিন মুকুল আব তাব বাবাও ঠিক এভাবেই একসঙ্গে এই শব্দটি উচ্চারণ কবেছিলো।'

'তা হলে-তা হ'লে জগমোহন নয় ?'

'জগমোহন নয় ?

রাকেশ সমাদ্দার আর সুমিত্রাদেবী আর্ত্ত জিজ্ঞাসায় মৃদু হেসে ইন্দ্রানী দেবী বললেন, 'না। একেবারে নয়। 'ঐ বৌদি ?'

'ঐ বৌদি!'

'আশ্চর্য! কী ভাবে ?'

ধৈর্য ধরুণ সবই বলছি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে মৃতদেহের কাছে গিয়ে আমি একটা গন্ধ পেয়েছিলাম ?'

'হ্যাঁ।'

'বলেছিলাম সেই গন্ধের, উৎসটিকেও পরে দেখতে পেলাম শচীনবাবুর বাড়ির পিছনে গিয়ে। 'কিমামের কৌটো ?'

'ঠিক। বাদলরামের কিমামের গন্ধ কেউ লুকাতে পারে না। এ বাড়িতে কৌটো খুললে ও বাড়ির লোক টের পেয়ে যায়। আর ঐ সিলকের কাপড়ের টুকরোটার কথাও নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে ?

'নিশ্চয়ই।'

'ঐ টুকরোটি জগমোহনের বৌদির। তার কোমরে সর্বদাই কোনো কাপড়ের বড়ো টুকরো রুমালের মতো গোঁজা থাকে, পান খান আর ঠোঁটের কষ বেয়ে পড়ে যাওয়া পানের রস মোছেন। সেটা ঐ মুহূর্তেও ঝোলানো ছিলো।'

'কিন্তু উনি কী ভাবে করলেন?'

'বলছি সব। মহিলাকে আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কাশীতে আপনার বাড়ির সামনের ঘরে সেলাইয়ের ইশকুল আছে না?

মহিলা মাথা নেড়ে বললেন 'হ্যাঁ।'

'আর ভিতরে?' চমকে তাকালেন, তাকিয়েই রইলো। আমি বললাম, আর ভিতরের ঘরে মেয়ে পাচারের পরামর্শ না?'

'বলছো কি ইন্দ্রানী। উত্তেজনায় সুমিত্রাদেবী ইন্দ্রানীর হাত চেপে ধরলেন। ইন্দ্রানী বললেন কাশী গিয়ে আমি এর সব খবরও নিয়ে এসেছিলাম। সংঘাতিক স্ত্রীলোক। বললাম, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাশীতে বসে আপনার সর্বরকম কুকর্মের সারথী মণিরাম পাণ্ডের সঙ্গে পাপের যে খেলা আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন, আজ শুধু খুনের মীমাংসাই নয়, তারও অবসান হবে। ঐ লোকটার পরামর্শে জগমোহনবাবুর মতো একজন অতি সরল মানুষকেও ঠকিয়ে একবার তাঁর স্ত্রীর একমাত্র চিহ্ন দামী পাথরের নেকলেশটি আপনি চুরি করেছিলেন। সত্য কিনা বলুন। একথা শুনে জগমোহন প্রাণহীন মাছের চোখে তাকিয়ে রইলেন, মেয়েটি এগিয়ে বসে পড়লো মেঝেতে। আবার জিজ্ঞেস করলাম 'বলুন কী ভাবে খুন করেছেন, আর কেন বা করেছেন।'

বললো, আমি করিনি।' আমি বললাম, 'ধরা পড়েও মিছে কথা? ভাবছেন প্রমাণ করতে পারবোনা?'

চুপ ক'রে থেকে খুব অবসন্ন ক্লান্ত ভঙ্গিতে দেয়ালে ঠেসান দিলেন? বললেন, 'আমি করিনি।' প্রচণ্ড জোরে ধমক দিয়ে বললাম, দেখুন চালাকি করে আপনি পার পাবেন না। অস্বীকার ক'রেও কোনো

লাভ নেই। সব প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি, এমন কি আপানার ডান হাতেব কাঁচের ভাঙা চুড়িব টুকরোটি পর্যন্ত। দেখুন তো এটা আপনার বাঁ হাতের চুড়িটা জোড়া কিনা। সেই কুড়িয়ে পাওয়া চুড়ির টুকরোটি আমি বার কবে দেখালাম। বললাম, 'এ চুড়ি কাশীর এবং আপনাব ডানহাতের। মোটা মোটা দু'গাছা চুড়ি আপনি সর্বদা দু'হাতে ব্যবহার করেন। সেদিন সকালে যখন, বেবোন তখন পর্যন্ত ও তো অটুট ছিলো, কিন্তু আজ নেই। কেন নেই সুলতাকে ধাক্কা মেবে ফেলে দেবব সময়ে ভেঙে গেছে। মুকুল তুমি বলোত ডান হাতটা কবে থেকে খালি দেখছো তোমাদেব জ্যাঠাইমাব। মুকুল ভয়ে বিস্ময়ে দুঃখে যেন বাহ্যজ্ঞান হাবিয়ে ফেলেছিলো। কেঁপে উঠে বললো, 'ঠিক মনে নেই, তবে যেদিন এসেছিলেন সেদিন দু'হাতেই চুড়ি ছিলো।'

কিমামেব কৌটোটা বেব কবলাম, আব দেখুন তো এ কৌটোটা চিনতে পারেন কিনা, ছুটে পালাবার সময় যেটা পড়ে গিয়েছিলো। শুনুন, ঐ ফাঁসেব সিলক্ টুকরোটিও আপনার। পঞ্চাশবার মুখ মুছেছেন, আর মুখের লালাসিক্ত কিমামে মাখামাখি করেছেন, আপনাকে পুলিশ কুকুবের মতো সনাক্ত ক'রে দিয়েছে।

মহিলা দারুণ শক্ত। তবুও ঘাবড়াচ্ছেন না। ভেঙে পড়ছে না। কতো বছর ধরে এসব কাজ করেছেন, যথেষ্ট শক্ত না হলে কি চলে? কী ধূর্ত। কতোগুলো লোককে ফাঁসাবার চেষ্টা করেছিলেন ভেবে দেখুন। কী রকম সরল মুখ করে সত্যের গন্ধ ছিটিয়ে বলেছিলেন, যে রাতে এখানে এলেন, পথে শচীনবাবুর বাড়ির পিছনে লাইট-পাস্টের তলায় ধীলনের মতো একটা লোককে হেঁটে যেতে দেখেছেন। সঙ্গে আবার একটা ছেলে। ঐ রামকেই বোঝাতে চাইছেন। সেটা ছেড়ে আবার শচীনবাবুর উপর সন্দেহ চাপাবার জন্ত বললেন, আমার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিলো।' আবার প্রথমদিন আমাদের বলে-

ছিলেন ওদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিলক চ্যাটার্জিকে নিয়ে প্রতি রাত্রেই ঝগড়া হতো, তিনি শুনতেন জানালা দিয়ে। এমনকি ওদের দাম্পত্য কলহের গোলমালে নাকি ওর পর ঘুম হতো না। আমার ইচ্ছা করে-ছিলো কি জানেন, আমি নিজেই ওকে গুলি করে মারি। হাত ধরে নাড়া দিয়ে বললুম, চুড়ির টুকরো, কিমামের কৌটো ফাঁসের রুমাল সবই তো দেখলাম, এবার তাহলে সমস্ত ঘটনাটা আমার মুখ থেকেই শুনুন। সেই রাত্তিরে এ বাড়ি এলেন, মুকুল দরজা খুলে দিল, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনলেন, সুলতাদেবী আয়াকে বলছেন, শচীনবাবু এতো রাতেও না ফেরায় তার চিন্তা হচ্ছে, আরো চিন্তা হচ্ছে এজন্য যে আজ শচীনবাবুর অনেক টাকা নিয়ে ফেরার কথা। শুনতে শুনতে আপনি নিজের নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকলেন। জিনিসপত্র রেখে কল ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে জানালা দিয়ে শচীনবাবুর বাড়ির দিকে তাকালেন, ততোক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন শচীনবাবু। আপনি দেখলেন তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা স্ত্রীর সঙ্গে এদিকের বারান্দা দিয়ে এসে সোজা ঢুকে গেলেন শোবার ঘরে। বারান্দাটা অর্ধচন্দ্রাকারে সব কটা ঘর বেষ্টন করে আছে। মাঝখানটা পড়েছে বসবার ঘরে, ঐ পাশটা পড়েছে গেষ্টরুমে। আর এ পাশটা, যে ঘরে আপনি এসে উঠেছেন সে ঘরের জানালা দিয়ে যে অংশটা দেখা যায় সেটা পড়েছে শোবার ঘরে। শোবার ঘরের পাশেই খাবার ঘর। পিছনে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খোলা দরজা দিয়ে নেমে কিছুটা জায়গা গাছপালা নিয়ে অন্ধকার। খিড়কির দরজা আছে একটি, কাজের লোকেরা যাতায়াত করে।

বাড়িটা সেকালের কোনো সাহেব সুবোর বাড়ি। জানালা দরজা সবই বিরাট বিরাট। গরমকাল। শোবার ঘরের পর্দা সরানো আপনি সেই ঘরের অনেকটা অংশ দেখতে পাচ্ছেন। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সুদৃশ্য বেডকভার ঢাকা মস্ত খাটের বিছানা নিভাঁজ, আপনি দেখলেন, ওঁরা ঢুকলেন। খাটে বসলেন, কী বলতে বলতে শচীনবাবু পকেট

থেকে এক বাণ্ডিল নোট বের ক'রে স্ত্রীর হাতে দিলেন।'

'আশ্চর্য! এতো কথা আপনি কি করে জানলেন?' প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে অনেক ভক্তিশ্রদ্ধা মিশিয়ে তাকালেন রাকেশ সমাদ্দার। ইন্দ্রানী বললেন, সবই আন্দাজ, সবই ছবি এঁকে বার করা। তাছাড়া আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে বলতে পারলে দোষী হঠাৎ দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং বলে দেয় সব। হ'লো ও তাই। এতোক্ষণ পরে মহিলা দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন। তার পরে স্বীকারোক্তিতে যা বেরুলো তা হচ্ছে ভদ্রমহিলা খুব গরীব ঘরের মেয়ে ছিলেন। জন্ম থেকে বাবাকে দেখেনি, দেখেছে শুধু বিধবা মাকে, যিনি খুব শুদ্ধা চারিনি ছিলেন না। একটু বড়ো হয়ে বুঝে ফেলেছিলেন তাদের ভরণ পোষণের পথটা পরিষ্কার নয়। মায়ের চলাফেরা উপার্জন সবই রহস্যাবৃত। যুবতী হয়ে উঠতে উঠতে তারি মধ্যে একদিন তার বিবাহ হ'য়ে গেল। মা-ই কোথা থেকে জুটিয়ে আনলেন পাত্র। পাত্রটি দালালি করে। যেমন: কোনো হোটেলের হ'য়ে চ'লে যায় স্টেশনে, ভ্রমনার্থীদের বোলচালে ভুলিয়ে নিয়ে আসে সেখানে। আগে এই রকমই ছিলো। লোকেরা যখন খুসি তখন টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে যে কোনো জায়গায় চ'লে যেতে পারতো, আবার সেখানে গিয়ে যে কোনো হোটেলেও উঠতে পারতো শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট স্টেশনে নামা মাত্র দালালে দালালে পাণ্ডাদের মতোই ছেঁকে ধরে, এমন টানাটানি করতো যে কাকে ফেলে কার কথায় কোন হোটেলে উঠবে ভেবে পেতো না। এমন ফাঁকা থাকতো হোটেল।

পাত্রটি এটাও করতো আবার বোলচালে ভুলিয়ে বেনারসী শাড়ির দোকানে নিয়ে গিয়ে বেনারসী কেনাতো। যে সব ঋতুতে বা ছুটিতে ভ্রমণার্থীর ভীড় বাড়তো তারও উপার্জন বাড়তো তেমনি। এই বৌদি ঐ স্বামীর সঙ্গে এই মায়ের বাড়িতেই সংসার পাতলেন। বছর কয়েকের মধ্যে মারা গেলেন মা এবং আর দু এক বছরের মধ্যে স্বামী ও মারা গেল।

কয়েকদিনের জন্য আতান্তরে পড়েছিলেন কিন্তু সহজেই সামলে উঠলেন। বয়েস কম, ছেহারা ভালো, কথাবার্তায় পটিয়সী এবং মা আর স্বামীর মাঝখানে স্যাণ্ডুইচ হ'য়ে বিবেকের সঙ্গেও তেমন বন্ধুতা হয়নি। পয়সার জন্য তিনি নানাধরণের জীবিকায় হাত পাকালেন। অবস্থার যতো পরিবর্তন হতে লাগলো লোভ ততোই বেড়ে উঠতে লাগলো। জগমোহন সরকার কোনো কারণে একবার কাশী গিয়েছিলেন, দৈবাৎ এই বৌদির সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় এবং কথা প্রসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে এই আত্মীয়তা। মহিলাটি এর আগে না পিত্রালয়ের না শ্বশুরালয়ের কোনো আত্মীয়কেই কখনো দেখেনি। হয়তো মনের অবচেতনে একটা আশঙ্কা ছিলো এই আত্মীয়তায় খুশি হয়েই এই দেবরটিকে নিয়ে যান তার নিজের বাড়ি। আদর যত্ন করেন। স্বামীকে উচ্চপদস্থ করার জন্য বলেন,' আপনার দাদার বেনারসী সাড়ির দোকান ছিলো কুঞ্জগলিতে। সবই কর্মচারীরা ঠকিয়ে নিয়েছে তবু যা দিয়েছে তাইতেই সুখেদুঃখে দিন কেটে যায় আমার। জগমোহন সরকার বৌদির দ্বারা একেবারে মুগ্ধ হয়ে ফিরে এলেন। অনেকবার করে নিজের বাড়িতে আসবার নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন। বৌদি এলেনও। এসে বাপ আর মেয়ের ছোটো সংসারটিকে বড়ো ভালো লাগলো। মা সৎ ছিলেন না, স্বামী সৎ ছিলো না, নিজেও সততার ধার ধারেন না কিন্তু জগমোহনের সততা এবং তার মেয়ের সরলতা তাকে আবর্ষণ করতো। তারপর থেকেই মাঝে মাঝেই আসেন, এক আধ মাস থাকেন, মনে শান্তি নিয়ে ফিরে যান।

এবার ও সেই উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন। পাপের পথে সর্বদাই যে অশান্তি, যে কষ্ট তার কোনো তুলনা নাই। কিন্তু নেশাও অদম্য। কাজেই সব অন্য রকম হ'য়ে গেল। আমি তাঁকে যেভাবে এঁকেছিলাম তিনি ঠিক সে ভাবেই এগিয়ে টাকার বাণ্ডিলটা দেখেছিলেন। শান্তি অশান্তি বিবেক বিবেচনা সত্য মিথ্যা স্থান কাল পাত্র সব মুহূর্তে ধূলিস্মাৎ। টুক করে নিজের ঘরের মিনমিনে আলোটা নিবিয়ে

দিয়ে ভালো ক'রে দেখতে লাগলেন। আগেই বলেছি বৌদির ঘরটা রাস্তার দিকে এবং একটা জানালা, শচীনবাবুদের শোবার ঘরের দরজার মুখোমুখি। কথাবার্তা ভালো শুনতে পাচ্ছিলেন না তবে একবার যেন শুনলেন ছেচল্লিশ হাজার টাকা। বুকের ভিতরে দামামা পিঠতে লাগলো.। টাকাটা হাতে নিয়ে তখনো দাঁড়িয়েছিলেন স্থলতা, ঐ অবস্থাতেই কথা বলছিলেন। শচীনবাবু জামা ছাড়লেন স্থলতা টাকার বাণ্ডিলটা বিছানার পায়ের তলায় তোষকের নিচে (খাটের যে অংশটা দেখতে পাচ্ছিলেন বৌদি) রেখে খাবার ঘরের দিকে গেলেন। খাবার ঘরের দরজাটা বারান্দা দিয়ে শোবার ঘরে যাবার দরজার মুখোমুখি। সেই দরজা দিয়ে আলো জ্বাললে রাত্রিবেলা খাবার ঘরেরও অনেকখানি দেখা যায়।

২২

মোহের মতো দেখছিলেন, জগমোহন বাইরে থেকে ডাকলেন, 'অন্ধকার' ঘরে কী করছেন বৌদি, এখানে আসুন।

বৌদি কাতর গলায় বললেন, 'বড্ড মাথা ধরেছে ঠাকুরপো, সারিডন খেয়েছি চুপচাপ শুয়ে থাকি খানিকক্ষণ, পরে যদি খাই খাবো, আপনারা খেয়ে নিন।' বলেই নিজের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

স্থলতা খাবার ঘরের থেকে আবার শোবার ঘরে এলেন। গরম পড়ছিলো খুব, শচীনবাবু বসে বসে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন। স্থলতা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে বললো কাল কিন্তু অবশ্য মিস্ত্রি ডেকো, এই গরমে পাখা চলছেনা, থাকা যায়?

শচীনবাবুও উঠে বারান্দায় এলেন' 'আজ যা দেখেছি দরজা বন্ধ করলে আর ঘরে টেকা যাবেনা।'

বারান্দায় এসে কথা বলতে এবং একাগ্রচিত্তে এদিকে তাকিয়ে থাকাতে কথাগুলো বৌদি শুনতে পাচ্ছিলেন।

সুলতা বললেন, 'এই বিপদ এনে ঘরে না রাখলে অন্তত আরো অনেক রাত পর্যন্ত দরজাটা খুলে রেখেই শুয়ে থাকতাম।

শচীনবাবু বললেন, 'এক কাজ করিনা এসো আমরা বারান্দায় শুই ঘরটা তালা বন্দ ক'রে রাখি।'

সুলতা বললেন, 'থাক, ধীলন এসেছে শহরে, কী জানি কখন কী দুর্মতি হয়।

শচীনবাবু হাসলেন, 'তুমি তো বলো ধীলন নাকি ভালো হ'তে চায়—'

সুলতা থেমে থেকে বললেন, 'তুমি সত্যি দেখেছো তো?

'সত্যি তো মনে হয়। তিলকের সঙ্গে দেখেছি বলেই যতোটুকু সন্দেহ।

আবার ঘরে ঢুকে যেতে সুলতা বললেন, 'যদি তিলকবাবু এখানে এসেই থাকেন তা হলে অবশ্যই কাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন তখনি সব জানা যাবে। এবার তুমি স্নানে যাও তো আমি খাবার ঠিক করি অনেক রাত হ'য়ে গেছে। সুলতা চলে যাবার পরেও শচীনবাবু খানিকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনিও ঢুকে গেলেন। বাঁ দিকে মোড় নিলেন। ঐদিকে বাথরুম। অর্থাৎ তিনি স্নানে গেলেন সুলতা খাবার ঘরে, শচীনবাবু বাথরুমে, কিছুটা সময়ের জন্য ঘরটা সম্পূর্ণ একেবারে ফাঁকা। যদি জায়গাটা এতো নির্জন না হ'তো, এমন শহরের এককোণে না হ'তো তা হলে যে কোনো পথচারী চট ক'রে ঢুকে পড়তে পারতো ঘরে, দু'এক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাজটা সেরে চলে যেতে পারতো। বৌদির বুকের দামামা প্রবল থেকে প্রবলতর হ'লো, মনে হলো তিনিই ছুটে চলে যান। হয়তো এদিক দিয়ে বেরুবার রাস্তা থাকলে যেতেনও কিন্তু যেতে হবে সদর দিয়ে। সেখানে নিশ্চয়ই জগমোহন সরকার আর তার মেয়ে দেখে ফেলবে এবং অবধারিত ভাবে

জিজ্ঞেস করবে কোথায় যাচ্ছো?' অতএব জিব দিয়ে ঠোঁট চেটেই সমস্ত লোভ সম্বরন করতে হ'লো। তারপর বলা যায় রাতটা তাঁর না ঘুমিয়েই কাটলো এবং সকালে উঠেই প্রথম যা মনে পড়লো, ঐ ছেচল্লিশ হাজার টাকা। কিছুতেই আর সে কথা ভুলতে পারছিলেন না! তাকালেন জানালা দিয়ে' দেখলেন শচীন বাবু বেরিয়ে রাস্তায় এসেছেন, সুলতা এগিয়ে দিতে এসেছেন বারান্দায়। ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'শোনো ওটা কখন নিয়ে যাবে?

শচীনবাবু বললেন বারোটার মধ্যেই আসবো, ঐ সময়েই কুলিদের পেমেণ্ট করতে হবে।' ভট্ ভট্ করতে করতে চলে গেলেন তিনি। চলে যাওয়ার দিকেই সুলতা তাকিয়ে ছিলেন। একটু বাদেই তিলক চ্যাটার্জি এলেন। সুলতা বললেন, 'আরে, আসুন আসুন—'

বৌদি তখন কাপড় 'সামলাবার ছল করে গেটের কাছাকাছি ঘোরা ঘুরি করছেন। প্রত্যেক মুহূর্তে ইচ্ছে করছে ছুটে চলে যাই ওখানে, গিয়ে কোনো সুযোগে টাকাটা নিয়ে আসেন। সুযোগ হয়তো মিলতো। সুলতা হয়তো অসাবধানতাবশত দরজা খুলে রেখেই এঘর ওঘরে নানা কাজে ঘুরে বেড়াতেন, নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে ফাঁকা থাকতো ঘরটা আর তিনি সেই সুযোগটা নিতেন।

কিন্তু বাদ সাধলো আবার ঐ তিলক চ্যাটার্জি। মনে মনে ফুঁসতে লাগলেন কিন্তু গেটের কাছ থেকে নড়লেন না। দেখলেন তিলক বাবুকে নিয়ে সুলতা শোবার ঘরের ঐ বারান্দাটাতেই মোড়া পেতে বসালেনা, কথা বলতে লাগলেন, চা করে নিয়ে এলেন দু'কাপ। কাজের মেয়েটি এলো, বাজারে পাঠালেন—সে পিছনের দরজা খুলে চলে গেল। চকিতে বিদ্যুৎ খেলে গেল মনে। ঘরে এলেন. সসব্যস্ত হ'য়ে, জগমোহনের মেয়েকে বললেন, মুণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছি, একটা মানত আছে কিনা, তুই দরজা বন্ধ করে দে।' এই বলে একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন? গেলেন সুলতাদেবীর বাড়ীর পিছন দিকের রাস্তায়। পিছন দিকের

দরজা দিয়ে ঢুকে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন। ভাবলেন ধরা যদি পড়ি বলবো, তুলসীপাতা, বেলপাতা আর আমের পল্লব লাগবে পূজোয় তাই নিতে এসেছি।

কিন্তু ধরা তিনি পড়লেন না। তাঁর অনুমান সত্য হলো। খানিক বাদেই তিলক চ্যাটার্জি উঠলেন, তাকে রাস্তা পর্যন্ত বিদায় দিতে সুলতা হেঁটে হেঁটে গেট পর্যন্ত চলে গেলেন। তক্ষুণি বৌদি ঢুকে পড়লেন ঘরে, সামান্য খোঁজাখুজিতেই পেয়ে গেলেন টাকার বাণ্ডিলটা। কিন্তু বেরুতে যাবেন এর মধ্যে ঘরে ঢুকে এলেন সুলতা। বৌদিকে দেখতে পাননি তিনি. যাচ্ছিলেন খাবার ঘরের দিকে, হঠাৎ মাথাটা ঘুরিয়ে অবাক হয়ে বললেন, একি ! আপনি ! বলার সঙ্গে সঙ্গেই বৌদি মরিয়া হয়ে সবশক্তি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারলেন একটা। প্রায় অচেতন ভাবেই কাজটা করেছিলেন। কেননা তার বোধ তাঁকে বলে দিল যখন দেখে ফেলেছেন তখন এই মানুষকে নিহত না করলে আর তাঁর পালাবার উপায় নেই। সুতরাং ধাক্কাটা মেরেছিলেন, কী করবেন কেমনভাবে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন এইসব চিন্তার একটা তালগোল পাকানো বিহ্বলতা থেকে কিন্তু নিজেকে রক্ষা করতে অসতর্ক সুলতা যখন ছিটকে উপুর হয়ে চৌকাঠে পড়েই গোঁ গোঁ শব্দ করে মুর্ছা গেলেন তৎক্ষণাৎ তার দুর্বুদ্ধি ঠাসা মাথায় বিদ্যুতের মতো একটা প্ল্যান খেলে গেল। কোমর থেকে টেনে রুমালটা খুলে চকিতে সুলতার গলায় একটা ফাঁস টেনে দিলেন। সিলকের ফাঁস বড়ো সহজ নয়। মূর্ছিত সুলতার শ্বাস প্রশ্বাস জন্মের মতো বন্ধ হয়ে গেল।

এইবার তিনি ছুটে আবার পিছনের দরজা দিয়ে পিছনের রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। একটি মানুষ নেই কোথাও। প্রায় দৌড়ে ঐ রাস্তা পেরিয়ে সদর রাস্তায় কাছাকাছি আসতেই একটা সাইকেল রিক্সা দেখতে পেয়ে উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। যেখান থেকে দূর পাল্লার বাস ছাড়ে সেই স্ট্যাণ্ডেই এসেছিলেন। কিছু না ভেবে উঠেও বসে-

ছিলেন কোনো একটা বাসে কিন্তু একটা স্টপ পেরুতেই বাজারের কাছে এসে মনে হলো এভাবে পালালে তার উপর সন্দেহ পড়া স্বাভাবিক। তক্ষুণি নেমে পড়লেন। একঠোঙা সন্দেশ কিনলেন, কিছু ফুল বেলপাতা কিনলেন। মোটকথা এমন ভাব করলেন যেন সত্যি পূজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে ফিরছেন। আন্দাজ মতো খানিকটা সময় কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ফিরে এলেন বাড়িতে। এসেই দেখেন ততোক্ষণে স্থলতাব মৃত্যু নিয়ে ভিড় জমে গেছে দরজায়।

বলাই বাহুল্য এই রকম ভীষণ ঘটনায় জগমোহন সরকার আর তাঁর মেয়ে ছুজনেই খুব আপসেট হয়ে পড়েছিলেন, তার সঙ্গেই গলা মিলিয়ে বৌদিও কান্নার ভান করে অনেকবার চোখ মুছেছিলেন। তার পরেই বললেন তোমাদের এই অবস্থায় ফেলে যেতে খারাপ লাগছে কিন্তু উপায় নেই। আমি এসেছিলাম এই পূজোটা দিতে একদিনের জন্য। বাড়িঘর সব খুলে যেমন তেমন করে রেখে এসেছি—ফিরে যাবো বলে। একজন ভদ্রলোক মারা যাচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছেন মুণ্ডেশরীতে পূজো দিয়ে তার প্রসাদ পেলে তিনি বেঁচে যাবেন। আমাকেই হাতে পায়ে ধরে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন আপনার দেওব আছে ওখানে, ওঠার স্থবিধে আছে আজই চলে যান রাতটা থেকে প্রসাদ নিয়ে কাল সকালে চলে আস্থন।

সেই মিথ্যে গল্প তার ফলপ্রস্থ হ'লোনা। সরকারী নিষেধাজ্ঞা খুব বলবৎ ছিলো তিনদিন পর্যন্ত। তারপরে যে জামিন রাখতে পেরেছে সে গিয়েছে। নিষেধাজ্ঞাটা এই কয়টি বাঙালী প্রতিবেশীর উপরই বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিলো। দেওরকে জামিন রেখে বৌদি নিশ্চযই চলে যেতেন, ভগবানই জ্বর দিয়ে আটকে দিলেন। নরক বলে তো কিছু নেই। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্তই মানুষকে ইহজন্ম করে যেতে হয।

তারপর! সকলেব সম্মিলীত কণ্ঠের রুদ্ধশ্বাস জিজ্ঞাসায় ইন্দ্রানী

মুখে মুখে তাকালেন। দেখলেন, রাকেশ সমাদ্দারের হাত থেকে সিগারেট খসে পড়লো, সুমিত্রাদেবীর বুক থেকে গাঢ় নিশ্বাস বেরিয়ে এলো, অমৃতাও বিস্ময়াবিষ্ট।

চুপ ক'রে থেকে বললেন, তারপর আর কি? পুলিশ এলো হাত-কড়া পরাতে। তিনি স্খলিত পায়ে অনুমতি নিয়ে একবার বাথরুমে গেলেন।

'তারপর।'

'তারপর আর ফিরলেন না।'

'ধরেও ধরতে পারলেন না। চোখে ধুলো দিয়ে শেষে বাথরুম দিয়ে পালালো?'

'অনেকক্ষণ কেটে গেলেও যখন ফিরলেন না, তখন সন্দেহ হলো।'

'তোমরা আচ্ছা বোকা।'

'ধাক্কাধাক্কি ক'রে অবশেষে ভেঙে ফেলা হ'লো দরজা। দেখা গেলো কলের নলে পরনের শাড়ি দিয়ে ফাঁসি লাগিয়ে ঝুলে আছেন। টাকার বাণ্ডিলটা একটা শুকনো জায়গায় রেখে গেছেন যত্ন ক'রে।

-শেষ-